ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

৬৩ বর্ষ ২০ সংখ্যা ।। ১৬ মাঘ, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ৩১ জানুয়ারি ২০১১ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ

পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি থেকে দৃষ্টি ফেরাতেই 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদে'র ধুয়ো

গুপ্তপুরুষ।। একেই বলে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির থেকে দেশের মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে এবং পাঁচটি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে মুসলিম ভোট পেতে কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারতের হিন্দু অতি গর্হিত পাপ কর্ম বলে চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হিন্দুর সামাজিক জীবনে হিংসা, রক্তপাত ইত্যাদির স্থান নেই। আজও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় হিন্দুর খাদ্যাভ্যাসে মাংসে ভোজন নিষিদ্ধ। সেই ভারতীয়

এরই নাম 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'!

- রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ আর এস এস এবং সিমি সমার্থক।
- কংগ্রেস নেতা শাকিল আহমেদের আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করার দাবী।
- স্বামী অসীমানন্দের 'গোপন জবানবন্দী'র নামে আদতে মিথ্যাচার।
- নিত্য-নৈমিত্তিক কংগ্রেস নেতাদের আর এস এস এবং হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির চরিত্র হননে নেমেছে। লাভ নেই। স্বাধীনতার ছয় দশক পরে দেশের মানুষ এখন আর বোকা নয়। 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ', 'গৈরিক সন্ত্রাসবাদ' ইত্যাদি চোখা চোখা শব্দ ব্যবহার করে কংগ্রেসের ধামাধরা মিডিয়া চমক সৃষ্টি করতে পারে। তাতে আখেরে লাভ নেই। ক্ষতিটাই বরং বেশি। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই হিন্দু। হিন্দু সনাতন ধর্মে সন্ত্রাসবাদ, গুপ্ত হত্যাকে হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত ঘাতক সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করলে তার জবাব অবশ্যই কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্ট নেতারা পাবে। হিন্দু অহিংস কিন্তু দুর্বল নয়। পাঁচটি রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে ব্যালটে হিন্দু তার অপমানের জবাব অবশ্যই দেবে। ভারতে সর্বকালের কুৎসিততম টেলিকম দুর্নীতি চাপা দিতে 'গৈরিক সন্ত্রাসবাদ' দেশের প্রধান বিপদ বলে চিৎকার করে লাভ নেই।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর দেখবেন পাঁচটি রাজ্যেই কংগ্রেসের অস্তিত্বই মুছে গেছে। ঠিক যেমনটি বিহারে হয়েছে।

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর এস এসকে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের জন্য অভিযুক্ত করেছে। এটা নতুন কোনও কথা নয়। গান্ধী হত্যা থেকে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা— যখনই কংগ্রেস জনসমর্থন হারিয়েছে তখনই আর এস এসকে আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। তাতে ক্ষতি হয়েছে কংগ্রেসেরই। দেশের মানুষ কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেনি। বরং বিশ্বাস করেছে সঙ্ঘ পরিবারকে। যতবার আঘাত এসেছে ততই জনপ্রিয়তা বেড়েছে নক্ষত্রগতিতে। এই তথ্য দিল্লির কংগ্রেস নেতাদের অজানা নেই। তাই কংগ্রেসের তুইফোড় তরুণ নেতা শাকিল আহমেদ আর এস এসকে "নিষিদ্ধ সংগঠন" বলে ঘোষণা করার দাবি জানালে প্রবীণ নেতারা আপত্তি জানান। প্রবীণ নেতারা জানেন যে এই ভুল করে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। দলকে ডুবিয়ে ছিলেন। মুসলিম ভোট পেতে হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী বলা এক কথা আর সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা অন্য কথা। সেক্ষেত্রে ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। হিন্দুর স্বাভিমানে আঘাত করে সেই যুদ্ধ জেতা অসম্ভব।

অতীতে মালেগাঁও, মক্কা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেসে ঘটা বিস্ফোরণের জন্য হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা দায়ী— এমন আজব অভিযোগ কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত জাতীয় তদন্ত সংস্থার গোয়েন্দারা সম্প্রতি এনেছে। সমঝোতা এক্সপ্রেসের নাশকতা ঘটেছিল

(এরপর ৪ পাতায়)

ভিলেন কি একা বুদ্ধ-ই?

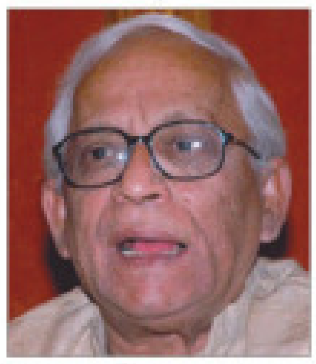

বিশেষ প্রতিনিধি।। কথায় বলে— বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। সিপিএম নেতৃত্বের বোধহয় এখন তাই হয়েছে। তারা তাঁদের পুরানো কায়দায় পেশীশক্তির বলে মানুষকে নিজেদের দিকে আনতে চায়। লালগড় দখলের জন্য সশস্ত্র শিবির গঠন করা এবং যৌথবাহিনীর সাহায্য নিয়ে নেতাই কাণ্ড ঘটানো— এসবই মৃত্যুর আগের সঙ্কেত মাত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের একজন শীর্ষকর্তা রাজভবনে বসে মহাকরণকে না জানিয়ে কিছু পুলিশ কর্তার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। ১৯৭০-৭২-এর প্রাক্কালে পি এন হাকসারও এই কাজ করেছিলেন। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন এক 'বিশেষ' পর্যবেক্ষকদলকে গোটা পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র সন্ত্রাসগ্রস্ত অঞ্চলের পরিস্থিতির গভীরের শিকড় খোঁজার সন্ধানে পাঠিয়েছেন। এই পর্যবেক্ষকগণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিহার রাজ্যের নির্বাচনীকর্তা (সি এ ও) সুরেশকুমার যিনি একজন আই পি এস। এই পর্যবেক্ষক দলের অবশ্য সকলেই আই পি এস। এঁরা রীতিমতো ধমক দিয়ে কাজ করছেন।

বলাই বাহুল্য, ইতিপূর্বে তৃণমূল নেত্রী একাধিক সভায় বলেছিলেন "আমরা সিপিএম-দালাল পুলিশ-কর্তাদের তালিকা রাখছি। ক্ষমতায় এলে তাঁরা শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাবেন না।" ওয়াকিবহাল মহলের একথা জানা যে রাজ্যের বহু আমলা এবং পুলিশকর্তা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নেত্রীর পক্ষে থাবার বার্তা দিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তৃণমূল নেত্রী বলেছিলেন, "পুলিশের মধ্যে ১ বা ২ শতাংশ খারাপ— বাকিরা ভাল।" অর্থাৎ পুলিশকে কি নিজের দিকে টেনে আনছেন?

আজকে বামফ্রন্টমন্ত্রীদের কথা মহাকরণের আমলা থেকে শুরু করে পুলিশের বহু কর্তাই গ্রাহ্য করেন না। কারণ তাঁরা বুঝে নিয়েছেন যে এদের বিদায়ের ঘণ্টা বেজে গেছে। আমলা-পুলিশ কর্তারা সব সময়েই ক্ষমতার দিকেই থাকেন! বাল্যকালের রূপকথায় পড়েছিলাম— "গোদাবাড়ি ভেলন নড়ি তুমি কার? যখন যার হাতে থাকি তাঁর।"

লেনিন তাঁর রাষ্ট্র ও বিপ্লব গ্রন্থে লিখেছিলেন— "রাষ্ট্রক্ষমতা যাঁদের হাতে থাকবে তাঁদের কথাই শুনবে রাষ্ট্রযন্ত্রের লোকেরা।" কমিউনিস্টরা এটি নগ্নভাবেই ব্যবহার করেছে। এবার এর বিপরীতমুখীন ব্যবস্থাটাও টের পাবে।

নেতাই-এ রথীন দণ্ডপাটের বাড়ি থেকে গুলি চলেছিল। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর যে আই পি এস-দের পর্যবেক্ষকবাহিনী পাঠিয়েছেন তাঁরা সিপিএম-এর কুকীর্তি একটির পর একটি উদ্ঘাটিত করছেন। রাজ্যের সিপিএম পার্টি বস্তুত দিশেহারা হয়ে গেছে। এতদিন পার্টির নেতারা নিচের তলায় দোষ দিয়ে সরব হতেন। এখন পরিষ্কার বোঝা গেল, নেতৃত্বই ইচ্ছে করে কর্মীদের ঔদ্ধত্য এবং মার-দাঙ্গা মনোভাব বাড়তে দিয়েছিল। তারই এক জঘন্যতম উদাহরণ— নেতাই গ্রামের ঘটনা। এ ঘটনা যেমন মর্মন্তুদ তেমনি

(এরপর ৪ পাতায়)

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিচ্ছিন্নতাবাদের কাছে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার এবং জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য সরকারের এরকম নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ সাম্প্রতিক অতীতে বিরল। গত ২৪ জানুয়ারির মধ্যরাতে দেড়-হাজারেরও বেশি ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা কর্মীদের নিয়ে কর্ণাটক থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া ব্যাঙ্গালুরু-নিউ দিল্লী কর্ণাটক এক্সপ্রেসকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো কর্ণাটক-মহারাষ্ট্র সীমান্ত থেকে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় জনতা পার্টি গত ১২ জানুয়ারি কলকাতা থেকে জম্মু-কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে 'একতা যাত্রা'র সূচনা করেছে। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে শ্রীনগরের লালচকে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার কথা বিজেপি যুব কর্মীদের। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা দেখিয়ে জম্মু-কাশ্মীর সরকার এতে অনুমতি দিতে নারাজ। এমনকী, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ওইদিন ওখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করার আর্জি জানিয়েছেন। কিন্তু বিজেপি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে দীর্ণ জম্মু-কাশ্মীরের মানুষকে সাহস যোগাতে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন সারা দেশ থেকে তাদের কর্মীদের লালচকে একত্রিত করে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা তুলতে তাঁরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। ঘটনার পর বিজেপি-র পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিতে পরিকল্পিতভাবে ব্যাপারটি ঘটানো হয়েছে।

২৪ তারিখ রাত দেড়টায় ট্রেনটি আহমেদনগরের সারোলা রেল স্টেশনে পৌঁছোয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন ব্যাঙ্গালুরু নিউ দিল্লী কর্ণাটক এক্সপ্রেস স্টেশনে পৌঁছোনো মাত্র, গোটা স্টেশন চত্বরে সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে ট্রেনটি থেকে ইঞ্জিন খুলে নেওয়া হয়। অন্য আরেকটি ইঞ্জিন জুড়ে ভিন্ন পথে ট্রেনটিকে নিয়ে

(এরপর ৪ পাতায়)

গত ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে শিলিগুড়িতে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের স্বয়ংসেবকদের সমাবেশে মঞ্চে আসীন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। তাঁর ডান দিকে ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার ও প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার। সরসঙ্ঘচালকের বাঁ দিকে প্রান্ত সঙ্ঘচালক হেমন্ত বর্মা।

সি পি এম নেতারা নরমুণ্ডে বসে ক্ষমতার জন্য তন্ত্রসাধনা করছেন

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

নেতাই গ্রাম— তার নাম হয়ে গেছে হত্যাই গ্রাম। এই গ্রামে নারীসহ ৮ জন-কে হত্যা করে সিপিএম-আশ্রয় শিবিরের 'হার্মাদ' অভিহিত সন্ত্রাসকারীবাহিনী। রক্তের হোলি উৎসব করেছে রাজনৈতিক কাপালিকরা। এদের জন্যে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু দেবার নেই। এটি হচ্ছে সিপিএম-এর নেতৃত্ব অর্থাৎ দীপক সরকার-সুশান্ত ঘোষ-এর অপারেশন দখল অভিযান। এদিকে সিপিএম-নেতারা প্রকাশ্য সভায় বলছেন— "মানুষের কাছে ক্ষমা চাও। ঔদ্ধত্য ত্যাগ কর। মাতব্বরি করো না।" অপরদিকে গোপন-সভায় ঠিক করে মুক্তাঞ্চল করার জন্য দখল-পুনর্দখলের অভিযান। এতই হিংস্র কাজকর্ম করেছে যে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মোকাবিলা করতে সাহস পাচ্ছে না। নেতাই গ্রামের রক্তের নদীর স্রোতে সিপিএম-এর পুনরায় ক্ষমতায় আসার খোয়াব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল— এমনকী দীর্ঘদিন এই অত্যাচার কাহিনী সাধারণ মানুষের মনে থাকবে।

নেতাই গ্রামে সিপিএম-এর তথাকথিত 'গৃহছাড়া'-দের আশ্রয়ে থাকা সশস্ত্র সান্ত্রীগণ গ্রামের গরীব মানুষদের শুধুমাত্র একমুঠো খাবার দিয়ে ঝি-চাকরের মতো কাজ করিয়েছে শুধু নয়, কাপড়-কাচা, রান্না করা, সমস্ত দৈনন্দিন কাজ মাসের পর মাস করিয়েছে। এমনকী জোর করে অস্ত্রশিক্ষা নেবার জন্য বাধ্য করেছে। অস্ত্র এমন জিনিস যা হাতে থাকলে তা ঘুরে দাঁড়াতে পারে— এ সত্যটা কি সিপিএম-এর দুর্বৃত্তরা জানে না?

সিপিএম যে শুধু তিন দশক ধরে সাধারণ মানুষের জন্য কোনও ভাবনা-চিন্তা করেনি তাই নয়, গরীব-নিঃস্বদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। অবশ্য সিপিএম নামক দলটি ভাঙনের সম্রাট। পার্টি ভেঙেছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং তা তারা করেছিল কংগ্রেসি তথা পুঁজিপতিদের 'দালাল' আখ্যা দিয়ে। আর এ-বঙ্গের সিপিএম নেতা-মন্ত্রীরা পুঁজিপতি টাটা-সালিম গোষ্ঠীকে কোলে করে নিয়ে এসেছিল। শ্রমিক সংগঠন ভেঙেছিল, কৃষক, যুব, ছাত্র, মহিলা সব সংগঠনই ভেঙেছিল সিপিএম-এর রণদিভে-অ্যান্ড কোং-এর উদ্যোগে।

এখন নন্দীগ্রাম থেকে নেতাই গ্রাম পর্যন্ত দরিদ্র মানুষদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে কাপালিকরা। দরিদ্র মানুষের মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক দাবা খেলায় মেতে নেতা-নেত্রীরা হিসেব করছে— কার ভাগে কোন দলীয় মৃতদেহ কাটা পড়বে। তারপর হতদরিদ্র মানুষদের শব নিয়ে 'শোক মিছিল' করে নিজেদের রাজনৈতিক জিঘাংসা চরিতার্থ করবে। গরীবদের মৃতের দেহের উপর রাজনৈতিক তান্ত্রিকরা শব-সাধনা করে সিংহাসনে বসার দিকে এগোবে। ধিক ধিক।

নেতাই গ্রামের ঘটনার পর সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে আবার ক্ষমতা ধরে রাখার খেয়োখেয়ি শুরু হয়েছে। দীপক সরকার-সুশান্ত ঘোষ গোষ্ঠীকে 'টাইট' দেবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তীকে কাজে লাগানো হয়েছে। এই নরহত্যা কাণ্ড করার পরও বিমান বসুর বক্তৃতা শুনে মনে হয় যে একজন সার্কাস-ক্লাউন।

নেতাই গ্রামের ঘটনার পর সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে আবার ক্ষমতা ধরে রাখার খেয়োখেয়ি শুরু হয়েছে। দীপক সরকার-সুশান্ত ঘোষ গোষ্ঠীকে 'টাইট' দেবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তীকে কাজে লাগানো হয়েছে। এই নরহত্যা কাণ্ড করার পরও বিমান বসুর বক্তৃতা শুনে মনে হয় যে একজন সার্কাস-ক্লাউন। বিমান-বুদ্ধদেব-নিরুপম-বিনয় —এই দুষ্ট চতুষ্টয়কে আগে বিদায় করা দরকার। নেতাই ঘটনার পর পার্টির অধিকাংশ সদস্যই এ-ঘটনায় ক্ষুব্ধ। ''হোয়াইট কালার্ড' কমরেডরা তো স্তব্ধ।

পার্টির আসন্ন আগামী পলিটব্যুরো সভাতে নেতাই ঘটনা নিয়ে আর একবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নেতৃত্ব অর্থাৎ বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-কে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। এঁদের পক্ষে কোনও একজন পলিটব্যুরো সদস্যও দাঁড়াবেন না।

কেউ কেউ নির্বাচন এগিয়ে আনার ব্যবস্থা চায়। কারণ— ক্ষমতার লালসায় জিহ্বার লাল গড়িয়ে পড়ছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন— ''সিপিএম-কে নিষিদ্ধ করতে হবে। এই কথার আসল অর্থ হলো— তৃণমূল সাংসদ কোনও বিরোধীদলকে রাখবেন না। এটাও জানি যে সিপিএমও কার্যত 'আমরা-তোমরা' করে, আমারা ২৩৫ বলে বিরোধীদের গলা টিপে ধরেছিল।

নেতাই গ্রামের ঘটনায় নিচের তলায় পুলিশকর্মীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আর যে-নেতা-মন্ত্রীর কথায় তাঁরা এইসব কাজ করেছেন তাঁদের রেহাই দেওয়া হবে কেন? সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব খুব ভালভাবেই জানেন যে রাজ্যের পুলিশবাহিনীর অধিকাংশই তাঁদের বিরুদ্ধে চলে গেছেন। সেটা এলাকায় এলাকায় টের পাচ্ছেন পার্টির নিচের তলার কর্মীরা। রাজ্যে অশান্তি-সন্ত্রাস-খুনোখুনির জন্য কোনও শিল্পপতি পুঁজি লগ্নী করবেন না। সিপিএম-এর গালে থাপ্পড় মেরে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের মধ্যে লগ্নী-শিল্প গড়ায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এই শিল্পগড়া শুধু শিলান্যাসকরণ নয়। অথবা দপ্তরের কোষাগার শূন্য করে খুসির-অর্থ বিলানো নয়। এ হলো সার্থক প্রশাসন। নরেন্দ্র মোদিকে সিপিএম 'দাঙ্গাকারী-হত্যাকারী' বলেছিল। সিপিএম তো তার থেকে বেশি দাঙ্গাকারী কিন্তু সন্ত্রাসকারী নিরীহ গ্রামীণ মানুষের হত্যাকারী হিসাবে সমগ্র দেশে ধিকৃত হয়েছে। চালুনি সূঁচের বিচার করে।

এখনতো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে নেতাই গ্রামে সিপিএম-এর 'হার্মাদ' বাহিনীই গুলি ছুঁড়েছে। উল্লেখ্য, ঘটনার অনতিকাল পরেই-পুলিশ কর্তা থেকে মহাকরণের কর্তারা সকলেই বলেছিলেন মাওবাদীরা এই ঘটনার স্থলে ছিল না। তাদের অভিযোগ হচ্ছে রাজ্য সিপিএম-নেতৃত্বের মাস্টারপ্ল্যান— এই প্ল্যানের এক্সিকিউটার হলেন দীপক সরকার-সুশান্ত ঘোষ অ্যান্ড কোং। এঁদের বিরুদ্ধে সূর্যকান্ত মিশ্র আর সূর্যকান্ত মিশ্রের পিছনে এখন নিজেদের বাঁচাতে বুদ্ধদেব-বিমান বসু। বুদ্ধ-বিমান শ্যামল চক্রবর্তীকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় পাঠিয়েছিলেন যাতে দীপক-সুশান্ত-কে দোষী প্রমাণ করার সব রসদ নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

পলিটব্যুরোর সভায় নিরুপমবাবু এ-সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন— তাতেও পার পাবেন না রাজ্য-নেতৃত্ব। কার্লমার্কস লিখেছিলেন— ''যখন কোনও ব্যবস্থায় পচন ধরে তখন ব্যক্তিকে বলির পাঁঠা করে ব্যবস্থাকে বাঁচাবার চেষ্টা হয়।'' কমিউনিস্টরা চিরদিনই ব্যক্তির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে হাত ধুয়ে ফেলে থাকে। যেমন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পূরণ চাঁদ যোশী-কে নিন্দা করে বহিষ্কার করা হয়েছিল— যদিও আজ সিপিএম যোশী কৃশেচভ-এর নীতিই চালাচ্ছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রীয় একতা যাত্রা

ঐতিহাসিক কলিকাতা শহর হইতে শুরু হইয়াছিল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাষ্ট্রীয় একতা যাত্রা এই বছরের জানুয়ারির ১২ তারিখে। সংগঠনের রাষ্ট্রীয় সভাপতি শ্রী অনুরাগ ঠাকুরের নেতৃত্বে এই যাত্রা ইতিমধ্যেই এগারোটি রাজ্য অতিক্রম করিয়াছে। প্রতিটি রাজ্য, জেলা ও শহরে দেখা গিয়াছে মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা, কে বা কাহারা বহন করিতেছে আমাদের জাতীয় পতাকা সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু বড় কথা হইল ভারতের রাজ্যে রাজ্যে, জেলায় জেলায়, প্রান্তে প্রান্তে আজ যে একতার অভাব দেখা দিয়াছে, বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়াছে, সেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন ও সাহায্যও করিয়া চলিয়াছে একদল বুদ্ধিজীবী। আমাদের রাজ্যের রাজ্যপাল মহোদয় সঠিকভাবেই এই সকল বুদ্ধিজীবীদের খোলখুলি বলিয়াছেন যে হিংসায় বিশ্বাসী কোনও রাজনৈতিক দলকেই কোনও আদর্শের মোড়কেই সমর্থন করা অন্যায়। শুধু অন্যায় নয়, ইহা একটি রাষ্ট্রীয় অপরাধও বটে।

দুঃখের কথা হইল, রাষ্ট্রীয় একতায় যাহারা কুঠারাঘাত করিতেছে তাহাদের পিছনে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী যেমন আছে, ঠিক তেমন ভাবে আছে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র। বিনায়ক সেনের বিরুদ্ধে মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগের অপরাধে ভারতীয় আদালত যখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়, তখন সুদূর আমেরিকা হইতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীগণ শ্রী সেনের পক্ষ লইয়া বিবৃতি দিতে ভারতে দ্রুত চলিয়া আসেন এবং আদালতের বিরুদ্ধে সরাসরি দোষারোপ করেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার পক্ষে বিপজ্জনক শক্তিগুলির বৃহৎ প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আর কি কোনও দ্বিধা জনগণের থাকিতে পারে? শুধু তাহাই নহে, একদল বিদেশীও আমাদের দেশের বিচারকগণের উপর চাপ দিতে শুনানীর দিন আদালতে হাজির থাকিবার দাবী জানাইয়াছে ভারত সরকারের নিকট। ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্তর্জাতিক যোগসূত্রে ভারতবর্ষের মানুষ যখন দিশাহীন, ঠিক সেই সময় ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার এই রাষ্ট্রীয় একতা যাত্রা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

গত রবিবার ২৩ জানুয়ারি এই যাত্রা পৌঁছিয়াছে পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে। পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ এই যাত্রাকে বিপুলভাবে স্বাগত জানাইয়াছে। পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহর অতিক্রম করিয়া এই যাত্রা আগামী মঙ্গলবার ২৫ জানুয়ারি লক্ষণপুর সীমান্ত পার হইয়া জম্মু-কাশ্মীরে পদার্পণ করিবে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় হইল কেন্দ্র ও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য সরকার এই একতা যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন প্রজাতন্ত্র দিবস রাজনীতি করিবার দিবস নহে। কাশ্মীরে প্রজাতন্ত্র দিবস পালনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন তাহার মতে বিভেদমূলক। তিনি শুধু বিবৃতি দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। শ্রীনগরে হাজার হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করিয়াছেন। সীমান্ত সীল করিয়াছেন। রাজ্য পুলিশের মাধ্যমে বিজেপি-র কার্যালয় সীল করিয়াই শুধু নহে, কার্যালয়ের সাইন বোর্ডও তুলিয়া ফেলিয়াছেন। রাজ্য নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়াছেন। কর্ণাটক হইতে একটি ট্রেন বোঝাই বিজেপিকর্মীদের ট্রেন-সমেত ঘুরপথে ফিরাইয়া দিয়াছেন। রেলমন্ত্রী এই রাষ্ট্রীয় একতা বিরোধী ভূমিকা অস্বীকার করিতে পারেন না।

প্রধানমন্ত্রীর এই ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে বিজেপি-র পক্ষ হইতে। অরুণ জেটলী প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কেমন করিয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন কর্মসূচী বিভেদমূলক হইতে পারে? তাহার মতে, প্রধানমন্ত্রী এবং তাহার সরকার এই ধরনের কাজের দ্বারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছেই আত্মসমর্পণ করিতেছেন।

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সমেত অন্যান্য তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুলি আওড়ানো দলগুলিও কাশ্মীরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিরোধিতা করিয়াছে। শুধু দুর্বলচিত্ত ভারত সরকারের প্রশাসনিক নীতিই নয়, দেশের রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও আজ দৃঢ় চিত্ত নীতি নাই। তাহাদের কাছে তথাকথিত মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিই কোনও সাহসী পদক্ষেপের পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী জনগণই বিচার করিবে কে সঠিক আর কে বেঠিক। পূর্বেই বলিয়াছি, কোন্ দল এই রাষ্ট্রীয় একতা যাত্রার উদ্যোক্তা তাহা প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে, প্রধান বিষয় হইল রাষ্ট্রীয় একতা, ইহাই একমাত্র কাম্য।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

যুদ্ধ ও শান্তি দু'য়ের মিলনেই পূর্ণ সত্য, অথচ এই দুইয়ের মধ্যে একটা বিরোধ ভাব আছে। উভয়ে উভয়কে আঘাত করে—যেমন পরস্পরকে আঘাত করে বীণার তার ও বীণাকারের অঙ্গুলি। অথচ এই সংঘাত না হলে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় না। এই সংঘাতটির অভাব ঘটলেই আসে শব্দহীন নিস্ফলতা। আমরা শান্তি চাই, কি যুদ্ধ চাই সেটা আসল কথা নয়। দু'য়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আনতে পারি কেমন করে—তাই ভাবনার বিষয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি কোন পথে?

তথাগত রায়

যে কোনও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল ভাঙা অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক দল মানে কি? রাজনীতি মানে যা হওয়া উচিত (যা যা হয়েছেন সে প্রসঙ্গে পরে আসছি) তা হলো যখন কিছু মানুষ মনে করেন একটা বিশেষ মতাদর্শ এবং নীতি অবলম্বন করে তারা জনসাধারণের কল্যাণ করতে পারবেন তখন তাঁরা একসাথে মিলিত হয়ে যে পদ্ধতিতে কাজ করেন তারই নাম রাজনীতি; এবং তাঁরা যে দল গঠন করেন তারই নাম রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করে (তা সে যে উপায়েই হোক) এবং ক্ষমতা পেলে নিজেদের মতাদর্শ ও নীতি রূপায়ণ করতে চেষ্টা করে।

এবারে এই সংজ্ঞাগুলি মমতা ব্যানার্জীর উপর প্রয়োগ করা যাক্। তাঁর নির্দ্বিধভাবে উদ্দেশ্য সিপিএম তথা বামফ্রন্টকে উৎখাত করা। এ ব্যাপারে তাঁর কোনও দ্বিচারিতা নেই এবং এটা যে অত্যন্ত সাধু উদ্দেশ্য এ সম্বন্ধেও রাজ্যের বেশির ভাগ মানুষ আজ একমত। প্রশ্ন হচ্ছে, তার পরে কী?

তার পরে নিশ্চয়ই মতাদর্শ ও নীতি রূপায়ণ করতে হবে। কি সেই মতাদর্শ? কি সেই নীতি? দুটোর কোনওটাই কারুর জানা নেই, মমতারও (মনে হয়) জানা নেই। ঘোষিত নীতি যদি না থাকে তাহলেও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে দেওয়া বিবৃতি থেকে নীতি ও মতাদর্শের একটা দিশা পাওয়া যায়। মমতার ক্ষেত্রে সে রকম কিছু পাওয়া গেছে কি? বোধ হয় না। এবং নীতি ও মতাদর্শ ছাড়া কেউ যদি ক্ষমতা দখল করে তাহলে তার ফল কতদূর শুভ হতে পারে সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে। দুঃখের বিষয় এটাই সাম্প্রতিক রাজনীতির চেহারা— অর্থাৎ 'যা যা হয়েছে'। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যতই মাওবাদী নিয়ে চেঁচামেচি করুক, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমস্যা মাওবাদী নয়— ছত্তিশগড়ে বা ঝাড়খণ্ডে হতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের অবশ্যই নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমস্যা নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিকভাবে বদ্ধ জলার অবস্থা এবং তজ্জনিত বেকারী। এবং সন্দেহ নেই, এই বদ্ধ জলার অবস্থা, যাকে ইংরাজিতে ইকনমিক স্ট্যাগনেশন বলা হয়, তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার নিরানব্বই শতাংশ দায়ী। আজ পশ্চিমবঙ্গে এমন অবস্থা যে শিল্পপতিরা এবং তাঁদের শিল্পপরিচালক অর্থাৎ একজিকিউটিভ শ্রেণীর মানুষ পশ্চিমবঙ্গকে গুটিবসন্ত-অধ্যুষিত অঞ্চলের মতো এড়িয়ে যান। কেন?

শিল্পপতি ও শিল্পপরিচালক শ্রেণীর মানুষ যা চান তার মধ্যে অগ্রগণ্য হলো শ্রমিক-মালিক-শিল্পপরিচালক সুসম্পর্ক। আরও চান পরিকাঠামো— অর্থাৎ ভাল রাস্তা, ভাল নাগরিক সুবিধা (যেমন পরিকল্পিত নগরী, স্কুল-কলেজ, শপিং মল, বিনোদনের ব্যবস্থা, যানবাহনের সুবিধা ইত্যাদি) বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি। এবং সর্বোপরি চান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সহযোগিতা। আমরা সবাই জানি পশ্চিমবঙ্গে এগুলোর কি অবস্থা। যে সরকারে আসীন দলের মতাদর্শই হচ্ছে 'শ্রেণী সংগ্রাম', যারা ক্রমাগত শ্রমিক-মালিক লড়াইকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় তাদের কাছে শ্রমিক-মালিক-শিল্পপরিচালক সুসম্পর্ক কখনও আশাই করা যায় না। এইজন্যই শিল্পপতি-পরিচালকদের মনে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ধর্মঘট-বন্ধ্-ঘেরাও গোছের কিছু শিল্পবিরোধী শব্দ।

পশ্চিমবঙ্গে পরিকাঠামোর মধ্যে রাস্তার কি অবস্থা তা বুঝতে হলে পাঠককে শুধু একবার শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত গাড়ি বা বাসে করে যেতে হবে। রাস্তা জুড়ে মানুষ-সমান গর্ত, তার মধ্যে জল জমেছে —ফলে গাড়ির চালকরা গর্তের গভীরতা বুঝতে পারে না, ধড়াস করে গর্তে পড়ে যায়, গাড়ির অ্যাক্সেল ভাঙে। নাগরিক পরিকাঠামোর নিতান্ত অভাব— যা আছে তা শুধু একমেবাদ্বিতীয়ম শহর কলকাতাতেই আছে। এই প্রসঙ্গে বলা ভাল, যখন ন্যানো কারখানা নিয়ে হৈচৈ হচ্ছিল তখন মমতা বলেছিলেন, শিল্পপতিরা কৃষিজমি চাইছেন কেন, পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার মতো অনুর্বর জায়গায় শিল্প করলেই তো হয়। আজ্ঞে না, হয় না। যে শিল্পপতি-পরিচালকরা আমেদাবাদ, বরোদা, ব্যাঙ্গালোর, মাইসোর, পুনে, নাগপুর ইত্যাদি শহরের নাগরিক পরিষেবা পেতে অভ্যস্ত তাঁরা হুড়া বা পাড়ায় কি করে থাকবেন? আর যদি থাকতে না চান তাহলে তারা সেখানে শিল্পস্থানই বা করবেন কেন? সরকার তো ওই সব জায়গা কোনও নাগরিক পরিকাঠামো তৈরি করেনি!

এসব ছাড়া বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি বাবদে কলকাতা ছাড়া কোথাও মোটামুটি রকমের বন্দোবস্তও নেই। বস্তুত, এই একটা শহর যেন পুরো রাজ্যটাকে শুষে খেয়েছে। বাকি রাজ্যটা বেঁচে আছে শুধু এই শহরটার সেবা করার জন্য!

দুঃখের বিষয়, এই সব সমস্যার বাবদে মমতার ভাবমূর্তিও বিশেষ উজ্জ্বল নয়— বহু শিল্পপতি-শিল্পপরিচালকই মনে করেন সিপিএম-এর জায়গায় মমতা এলে রাজনৈতিকভাবে মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে বটে। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে কোনও উন্নতি হবে না। এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে সিঙ্গুর থেকে ন্যানো (টাটার ছোট গাড়ী) চলে যাবার ফলে। এই লেখকেরও দৃঢ় বিশ্বাস, এই একটি ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নকে যতটা পিছিয়ে দিয়েছে তা বিশাল এবং সিপিএম-এর শ্রমিক জঙ্গিপনা বা পরিকাঠামোগত ত্রুটির সঙ্গে তুলনীয়। মমতার উচিত ছিল না আন্দোলনকে এতদূর নিয়ে যাওয়া যে তার ফলে টাটারা সদলবলে চলে যান। এই প্রসঙ্গে একটা আপাত-অপ্রিয় কথা বলতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সরকার গরীব-দরদী, গরীব মানুষের কথা ভাবে— এগুলো শুনতে খুবই ভাল, আচরণ করলে আরও ভাল, কিন্তু এতে শিল্পস্থাপন করার জন্য শিল্পপতি-পরিচালকদের মনে কোনও উৎসাহ জাগায় না। শিল্পপতি-পরিচালকরা মোটেই গরীব নন— তাঁরা 'বড়লোক'ই এবং যদি রাজ্যকে তাঁদের লগ্নী টেনে আনতে হয় তবে তাঁদের জন্য আকর্ষণীয় ব্যবস্থাও তৈরি করতে হবে।

ছেঁড়া শাড়ি ও হাওয়াই চটি যেহেতু এই আকর্ষণ জাগাবে না, তাই আগামীদিনে এরাজ্য বড় আকারের লগ্নী হবার আশা কম। লগ্নী ছাড়া বেকার সমস্যাও ঘুচবে না। তাই কি সিপিএম, কি তৃণমূলের সবসময়েই চেষ্টা; যেন বেকার সমস্যাটা চাপা দেওয়া যায়, কারণ এর সমাধানের পথ এই দুই দলের হাতে নেই। সেইজন্যই মাওবাদী নিয়ে এত চেঁচামেচি করা।

তৃণমূল ক্ষমতায় এলে আরও বেশকিছু সমস্যার উদ্ভব হবে। যে রকম সংখ্যালঘু তোষণের পথে তৃণমূল ভোটে জিতবার জন্য এগোচ্ছে, তাতে আগামীদিনে মুসলিম জঙ্গিপনা বাড়বে এবং শুধু সংবাদমাধ্যমের নীরবতা দিয়ে একে চেপে রাখা যাবে না। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি দেগঙ্গা (উত্তর ২৪ পরগণা) পাঁচলা (হাওড়া) খিরিষতলা (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) ইত্যাদি অঞ্চলে এই ধরণের জঙ্গিপনা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। পথেঘাটে মহরমের চাঁদার জুলুমের কথাও শোনা যাচ্ছে।

আর এক সমস্যা হবে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোঁদল। যেহেতু তৃণমূলের চেহারাটা মৌচাকের মতো— একজন মক্ষিরাণী এবং অন্য সবাই কর্মী— তাই যতক্ষণ দলের একটাই লক্ষ্য অর্থাৎ সিপিএম-কে অপসারণ, যা মধু আহরণের সঙ্গে তুলনীয়, ততক্ষণ দল ঠিক চলবে। কিন্তু সরকারকে তো বহু দিকে দৃষ্টি দিতে হবে! তখন তৃণমূলের 'হায়ারার্কি' বা সাংগঠনিক ধাঁচার অভাবটা খুব বড় হয়ে দেখা দেবে। এই সবের সম্মিলিত ফল হবে আগামী নির্বাচনের দুই-আড়াই বছরের মধ্যে মমতার চাকচিক্য হ্রাস এবং কালক্রমে সম্পূর্ণ অরাজকতা। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি দুটোর একটা করবার জন্য তৈরি থাকবে। এই দুটোর একটা হলো সিপিএম-এর প্রত্যাবর্তন এবং এবার সিপিএম এলে একশো বছরও থেকে যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করবার নেই। আর একটা হলো বিজেপির প্রধান বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা— যদি এর মধ্যে বিজেপি ওই অবস্থার জন্য তৈরি হয়ে নিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের সরকার গরীব-দরদী, গরীব মানুষের কথা ভাবে— এগুলো শুনতে খুবই ভাল, আচরণ করলে আরও ভাল, কিন্তু এতে শিল্পস্থাপন করার জন্য শিল্পপতি-পরিচালকদের মনে কোনও উৎসাহ জাগায় না। শিল্পপতি-পরিচালকরা মোটেই গরীব নন— তাঁরা 'বড়লোক'ই এবং যদি রাজ্যকে তাঁদের লগ্নী টেনে আনতে হয় তবে তাঁদের জন্য আকর্ষণীয় ব্যবস্থাও তৈরি করতে হবে।

ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে সরব সুপ্রিম কোর্টও

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে আবারও সরব হলো ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। রবীন্দ্রকুমার পাল ওরফে দারা সিং-এর বিরুদ্ধে ওড়িশা আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি পি সত্যশিবম এবং বিচারপতি বি এস চৌহ্বানের ডিভিশন বেঞ্চ গত ২১ জানুয়ারি একটি রায়ে জানায়, "কোনও মামলাকে বিরলতমের মধ্যে বিরলতম বলতে গেলে তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিটাও বিচার্য হওয়া দরকার।" এই পরিস্থিতি বিচার করেই আদালত মনে করছে ১৯৯৯ সালের ২২-২৩ জানুয়ারি ওড়িশায় গ্রাহাম স্টেইনস ও তার দুই শিশুপুত্রকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার যে অভিযোগে ওড়িশা হাইকোর্ট দারা সিং-কে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোই যথোপযুক্ত হবে বলে জানিয়েছে, তা পুনর্বিচারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কারণ দেশের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী ভয় দেখিয়ে এবং প্রলোভন বা সেবার আড়ালে এদেশে ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ। তাই গ্রাহাম স্টেইনস সমাজসেবার আড়ালে যেভাবে গরীব জনজাতিদের খৃস্টান ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন তাতে তাঁকে 'শিক্ষা দেবার' একটা প্রয়াস ওই ঘটনায় পরিলক্ষিত হয়েছে বলে শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে। সেই কারণেই আদালত মনে করছে ঘটনায় দোষী দারা সিং-কে সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়াই উচিত কাজ হবে। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন— ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের সরব হওয়া বুঝিয়ে দিল ভারতের বুকে খৃস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ উদ্বেগে রেখেছে আদালতকেও।

ভিলেন কি একা বুদ্ধ ?

(১ পাতার পর)

ঘৃণ্য। তাই সিপিএম-এর সদ্য সমাপ্ত পলিটব্যুরো সভায় এ-রাজ্যের পলিটব্যুরো সদস্যগণ ছাড়া প্রত্যেকে এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেছেন —"আমরা জোর করে কিছু করবো না।"

বারংবার তলব করা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য দিল্লীতে চিদম্বরম-এর মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত পশ্চি মবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী চিদাম্বরমের কাছে স্বীকার করেছেন, "সিপিএম-এর সশস্ত্র শিবির ছিল"— যাদের 'হার্মাদ' ক্যাম্প বলে চিদম্বরম পত্রে অভিহিত করেছিলেন। এই ঘটনার ছক তো রাজ্য সিপিএম-নেতৃত্বের সম্মতিতেই দীপক সরকার-সুশান্ত ঘোষ কোং করেছিলেন। সিপিএম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঘটনাকে জেনেও বাধা দেয়নি কেন? এখন খোদ মুখ্যমন্ত্রীই ঘটনার দায় স্বীকার করে নেওয়ায় তার বিরুদ্ধে পার্টি লাইন অমান্য করার অভিযোগ তুলছে খোদ দলের সম্পাদক প্রকাশ কারাত। নেতাই কাণ্ড নিয়ে বামফ্রন্টের সভায় বিমানবাবু আদালতের দোহাই দিয়ে শরিকদের মুখ চেপে দিয়েছিলেন। এই শরিকরা কিন্তু সিপিএম-কে বাদ দিয়ে নির্বাচনী আঁতাত গড়ার আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। যদিও এই শরিকরা লাভের গুড় খেয়ে পেটে ভরিয়েছেন— স্ফীত হয়েছে শরিকপার্টি-মন্ত্রীদের উদর। সব মিলিয়ে সিপিএমের এখন সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ সরকারের

(১ পাতার পর)

যাওয়ারও চেষ্টা করা হয়। গন্ডোগোলের আশঙ্কায় দু'শো জনের আর পি এফ বাহিনীর দু'টি বগিও তাতে জুড়ে দেওয়া হয়। স্টেশন চত্বরও আর পি এফ জওয়ানে ছয়লাপ ছিল। সারোলা স্টেশনে ঘণ্টাখানেক দাঁড়ানোর পর গন্তব্যের বিপরীতমুখী আলালকোট-গুলবার্গ-ওয়াদি রুটে ট্রেনটি যেতে থাকে। বিজেপি কর্মীরা তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। জেগে উঠে তাঁরা বিপত্তিটা ধরতে পারেন। মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক সীমান্ত এলাকায় নাগানসুরা স্টেশনে তাঁরা ট্রেনটাকে দাঁড় করান।

এ বিষয়ে রেলের ডিভিশানাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার বি এল কোরি জানিয়েছেন, 'সেফটি মেজার'-এর ব্যবস্থা হিসেবেই এটা করা হয়েছে। এক উচ্চপদস্থ আর পি এফ আধিকারিক জানিয়েছেন, যা নির্দেশ এসেছিল উপরমহল থেকে, তাই তাঁরা পালন করেছেন। পুরো ঘটনায় এর বেশি তাঁদের হাত নেই। প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্র সরকার স্বঘোষিতভাবে বিজেপি-র 'একতা যাত্রা'র বিরোধী।

সব ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, রাজনৈতিক ভাবে বিজেপি-র একতা যাত্রা তথা ২৬ জানুয়ারি শ্রীনগরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মোকাবিলা না করতে পেরে সরকারী শক্তির অপব্যবহার করে বিজেপি-কে আটকাতে চাইছে কংগ্রেস।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

দুর্নীতি থেকে দৃষ্টি ফেরাতেই 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদে'র ধুয়ো

(১ পাতার পর)

২০০৭ সালে। তখন এই গোয়েন্দারাই দাবি করেছিল হুজি, লস্কর এবং সিমির সন্ত্রাসবাদীরাই নাশকতার জন্য দায়ী। জাতীয় তদন্ত সংস্থার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই ইউনাইটেড নেশন লস্কর-ই-তৈবাকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে চিহ্নিত করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এখন সেই সংস্থারই গোয়েন্দারা যদি বলেন, তিন বছর আগে আমাদের তদন্তে গাফিলতি ছিল। আমরা ভুল করেছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই তদন্তে এমন মারাত্মক ভুল বা গাফিলতির জন্য তদন্তকারী গোয়েন্দাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিৎ নয় কি? বিশেষতঃ ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে ইউনাইটেড নেশনকে বিভ্রান্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মুখ পুড়েছে। যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সমবেতভাবে দাবি জানায় যে লস্করকে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলা যাবে না, যদি লস্কর মানহানির জনা ক্ষতিপূরণ দাবি করে তখন মনমোহন সিং সরকার কী জবাব দেবেন। হ্যাঁ, এর উত্তর দিতে হবেই।

আরও একটি জরুরী প্রশ্ন আছে। অসীমানন্দের তথাকথিত 'স্বীকারোক্তি' নাকি বলেছে কিছু হিন্দু নেতার নির্দেশে মালেগাঁও, মক্কা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ভাল কথা। তবে এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি তিনি দিয়েছেন রুদ্ধ দ্বার কক্ষে। সেখানে অভিযুক্তের আইনজীবী মনবীর সিং রাঠিরও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এমন একটি গোপন জবানবন্দি কীভাবে মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে? যে রুদ্ধ দ্বার কক্ষে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ছিল না। অসীমানন্দের আইনজীবী রাঠি জানিয়েছেন যে তাঁকে তাঁর মক্কেল অভিযোগ করেছেন গোয়েন্দারা 'থার্ড ডিগ্রি' শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে তথাকথিত স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করেছে। রাঠি বলেছেন, আদালতে মামলা উঠলে তিনি প্রমাণ করবেন কীভাবে তাঁর মক্কেলের জবানবন্দী আদায় করা হয়। আদালতে তদন্তকারী গোয়েন্দাদের প্যান্ট খুলে নেবেন বলে দাবি করেছেন রাঠি। প্রশ্ন তুলেছেন, নাশকতা চালানোর পর নাশকতার সঙ্গে যুক্ত সংগঠন দায় স্বীকার করে। কারণ, সন্ত্রাসবাদী নাশকতার উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রচারের আলোয় আসা। তাই তারা দায় স্বীকার করে। জানায় কেন তারা নাশকতা চালিয়েছে। মালেগাঁও, মক্কা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেসের বিস্ফোরণের পর কোনও হিন্দু সংগঠন দায় নেয়নি। অসীমানন্দের প্রচারিত তথাকথিত স্বীকারোক্তি বিশ্বাস করলে চিহ্নিত হিন্দু সংগঠনের দায় স্বীকার করা উচিৎ ছিল। তা হয়নি। কেন? এর জবাব আপনাদের কারও কাছে আছে কি?

এই সময়

প্রাতঃশমন

গত ১১ জানুয়ারি শীতের দিনের হিমেল ভোরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন জনৈকা আরতি সেনগুপ্ত। কলকাতা পুরসভার ৫নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত টালা ঝিল পার্কে প্রাতঃভ্রমণকালে পাইকপাড়া নিবাসী আরতিদেবীকে পুরসভার একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা মারে এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রশ্ন উঠছে, শরীর সচেতন প্রাতঃভ্রমণকারীদের তবে কি শরীর বিসর্জন দিয়েই তার মূল্য চোকাতে হবে? এতসবের পরেও উদাসীন প্রশাসন। এলাকাবাসীদের প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা— শরীর বাঁচাতে প্রাতঃভ্রমণ আবশ্যক। কিন্তু প্রাতঃশমন ঠেকাবার দায়িত্ব কার?

দুষ্কৃতীরক্ষার কর্তব্যবোধ

দেগঙ্গা, জয়নগরের পর এবার দক্ষিণ চবিবশ পরগণার সুন্দিয়া। পুলিশি কর্তব্যবোধের নির্লজ্জ নমুনা পুনরায় প্রত্যক্ষ করল হিন্দুরা। ভাঙ্গর থানার অন্তর্গত ঘটকপুকুর-সোনারপুর রোডের ওপর অবস্থিত প্রাচীন সুন্দিয়া মহাশ্মশানে গত ৯ জানুয়ারি সকাল ১০টা নাগাদ ২৮-৩০ জন সশস্ত্র মুসলিম দুষ্কৃতী পরিকল্পনা মাফিক শ্মশানের জায়গা দখল করতে আসে। শ্মশানের দেবত্তর সম্পত্তি দখলে হিন্দুরা বাধা দিলে লাঠি, রড, ছুরি নিয়ে মুসলিম দুষ্কৃতীরা চড়াও হয় তাদের ওপর। এলাকার হিন্দুদের সম্মিলিত বাধায় সাময়িকভাবে ওই দুষ্কৃতীরা পিছু হটলেও এরপর ক'দিন ধরেই নানা অছিলায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। অবশেষে বাধ্য হয়ে স্থানীয় মানুষজন সোনারপুর-ঘটকপুকুর রোড অবরোধ করেন। মুসলিম দুষ্কৃতী তাণ্ডবের সময় যাদের টিকিটি দেখা যায়নি, এখন সেই ভাঙ্গর থানার ওসিসহ বিশাল পুলিশবাহিনী 'মহান কর্তব্যবোধে' উদ্বুদ্ধ হয়ে অবরোধ তুলতে আসে। সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ। ভুক্তভোগীরাই কেবল শাস্তি পায়, আর অপরাধীরা গায়ে হাওয়া লাগায়।

ব্র্যান্ড নরেন্দ্র মোদী

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসলে একটা ব্র্যান্ড। শুধু শিল্পপতিরাই এই ব্র্যান্ডকে কাজে লাগাচ্ছেন না। এদেশের রাজনীতিকরা, এমনকী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতারাও ঝোপ বুঝে কোপ মেরে মোদীর ব্র্যান্ডকে দিব্যি কাজে লাগাচ্ছেন। ক'জন রাজনৈতিক নেতার জীবদ্দশায় এহেন সৌভাগ্য হয়েছে তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। যেমন ধরুন দার-উল-উলুমের গভর্নিং বডি 'শোওরা'র সদ্য নির্বাচিত 'মহতামিম' (প্রধান) গুলাম মহম্মদ ওয়াসতানভিরের অবস্থাটা। অ্যাদ্দিন দিব্যি প্রশংসা করছিলেন নরেন্দ্র মোদীর। এমনকী ২০০২-এর গোধরা পরবর্তী কান্ডে তাঁকে ক্লিনচিটও দিয়েছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাথায় বসার ইঙ্গিত পেলেন অমনি বলে বসলেন, 'মোদীকে ক্ষমা করবো না 'মোদী-কে মুসলিম সমাজ দেখে নেবে' ইত্যাদি। এসব না বললে কি মুসলমান সমাজের মাথায় চড়া যায়?

কাশ্মীর ও প্রধানমন্ত্রী

কাশ্মীর কি আদৌ ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য? নাকি দেশের মধ্যে দেশ?— এই প্রশ্নগুলির উত্থাপন যে ভারত-বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকেই পুষ্ট করবে একথা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং জানেন না এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু তাঁর দল ও সরকারের মদতে জম্মু-কাশ্মীরের ওমর আবদুল্লা সরকারের কার্যকলাপে ভারত-বিরোধীরা এই প্রশ্নগুলি তোলারই সুযোগ পাচ্ছে। গত ২৪ জানুয়ারি জম্মু-কাশ্মীরে দলীয় কর্মসূচী 'একতা যাত্রা'-র জন্য যাওয়া লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী সুষমা স্বরাজ এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলিকে গ্রেপ্তার করে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের পুলিশ। ওমর আবদুল্লার অজুহাত— যেহেতু রাজ্যসরকার 'একতা যাত্রা'য় অনুমতি দেয়নি তাই ওই দুই নেতাকে গ্রেপ্তার। প্রশ্ন উঠছে, কাশ্মীর কি বিদেশ? দেশের দুই প্রধান বিরোধী নেতা-নেত্রীকে গ্রেপ্তার করার সাহস ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হয় কি করে? স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও বিজেপি-র কাছে এই কর্মসূচী বাতিলের আবেদন জানিয়ে এতে আস্কারাই যুগিয়েছেন।

অতিথি কলম

রাজনৈতিক নেতা, তল্পিবাহক, শিল্পপতি, মিডিয়া

সবাই এক নৌকার যাত্রী

জয় দুবাসী

মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই অনেক অনেক শিল্প রয়েছে— যেমন বয়ন, রসায়ন, ভেষজ প্রভৃতি অনেক শিল্প। কিন্তু দিল্লিতে রয়েছে কেবল একটিই শিল্প এবং যা ফুলে ফলে বাড়ছে— তা হলো রাজনীতি। এবং যতদূর জানা যায় দিল্লিওয়ালারা এই একটি শিল্প থেকেই যথেচ্ছ রোজগার করে পকেট ভারী করছে।

যদি একদিন দিল্লির কোনও এক সরকারী অফিসে যান কোনও এক দুপুরে, দেখবেন ব্রীফকেস হাতে অসংখ্য মানুষের আনাগোনা। তারা অফিস চত্বরে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায়। মনে হবে উদ্দেশ্যহীনভাবে, কিন্তু তারা জানে কোথায় এই ব্রীফকেস পৌঁছে দিতে হবে। এরাই সেই তথাকথিত জনসংযোগকারী যারা সারা শহরময় যেসব অফিস রয়েছে, সেইসব অভিজাত পল্লীতে এদের যাতায়াত। মুম্বাই-এর শিল্পগুলিতে যে অর্থের আদান-প্রদান হয় তার চেয়ে ঢের বেশি লেনদেন এখানে হয়ে থাকে।

এদের দায়িত্ব কেবল জনসংযোগ নয়। এইসব কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলারা 'ফিক্সার' নামে পরিচিত। কখনও এরা কখনও বড়হাতের 'এফ' কখনও বা ছোট হাতের 'এফ' লিখে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রীর দপ্তরে এদের কম দেখা গেলেও এদের দেখা মেলে প্রেস ক্লাবে, কখনও বা পাঁচতারা হোটেলের কফি শপে। এদের অনেককে আবার সাংবাদিকের ভেক ধরে মুম্বাই বা অন্যত্র ঘুরতে দেখা যায় সাক্ষাৎকারীদের তালিকা হাতে নিয়ে।

না, না, কখনও-ই ভাববেন না যে এই ফিক্সিং ব্যবসা কেবল ভারতেই রয়েছে। দুনিয়ার সর্বত্রই— তা সে হোক ওয়াশিংটন বা মস্কো অথবা লণ্ডন থেকে বেজিং সর্বত্রই এদের প্রভাব। ওয়াশিংটনকে বলা হয় ধনতন্ত্রের স্বর্গ। আর ওখানে বাজার-ই অর্থনীতির নিয়ন্তা। সরকারের ভূমিকা মার্কিন বাজারে গৌণ। তাই সেখানে এই 'ফিক্সার' দেখা যায় যত্রতত্র। এদের বলা হয় 'লবিইস্ট' বা চামচা। এরা বিধায়ক, কংগ্রেসম্যান, সেনেটরদের নিয়ন্ত্রণ করে সেদেশে আইন তৈরি করার আগেভাগেই। যদি আইনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তো সবকিছুই নিজ তাঁবে এসে পড়ে।

মার্কিন মুলুকে এমন শত শত 'ফিক্সার' আছে এবং যতক্ষণ আপনার কাছে লাইসেন্স আছে ততক্ষণ আপনি চামচা বনে থাকতে পারবেন। আর সেনেটর, কংগ্রেসম্যান নির্বাচনে হেরে গেলেই এরা লবিইস্ট হয়ে যায় এবং এরা এদের প্রভাব খাটিয়ে টু-পাইস রোজগার করে। এমনই একজন প্রাক্তন আমলা হলো কিসিংগার বা তাঁরই সমগোত্রীয় যাঁরা নিজেদের সামরিক বিশারদ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টার কাজ করেন। নিউইয়র্কের বাইরে কিসিংগারের কোম্পানী রয়েছে যার সাহায্যে লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করেন। কিসিংগারের ওই সংস্থা ডলারের বিনিময়ে সৌদি আরবের রাজা বা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেয়। জর্জ ডব্লু বুশের বাবাও প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। উনিও এইরকম লবিইস্টের কাজ করে বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার রোজগার করে থাকেন।

টেবিলের নীচে দিয়ে যেসব লেন-দেন হয়ে থাকে তা এই মধ্যস্থকারীদের মাধ্যমেই করে থাকে কর্পোরেট সংস্থাগুলি। লাইসেন্স ও পারমিট রাজ বদলে গেছে লাইসেন্স এবং দালালি-রাজে। এখন এই দালালদের ভূমিকা অতীতের মধ্যস্থকারীদের থেকে অনেক বেশি সক্রিয়। প্রকৃতপক্ষে কিছুই পরিবর্তন হয়নি। ফরাসী প্রবাদ মতে, যতই পরিবর্তন হোক না কেন ততই তারা একই থাকবে।

ভারতে অবশ্য এই ব্যবস্থা একটু অন্যরকম। এখানে বেশ্যাবৃত্তির মতো লবি ব্যবহারকে এক ধরনের পূতিগন্ধময় বলে মনে করা হয়। এখানে এই কাজে জড়িত থাকেন সাংবাদিকরাও। যেমন এখানে নীরা রাদিয়ার মতো একজন পেশাগত লবিইস্ট রয়েছেন। এঁর আলাদা কোনও যোগ্যতা না থাকলেও ইনি তাঁর নিজের পছন্দমতো লোককে মন্ত্রীসভায় স্থান করে দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। তাঁর অধীনে এমন মাইনে করা ডজনখানেক সাংবাদিক রয়েছে যারা এই কাজে যুক্ত। এই কাজে চার শো কোটি টাকা লগ্নী করা হয়েছে।

সুতরাং রাদিয়া কোটি কোটি টাকা এই ডজনখানেক সাংবাদিকের মাধ্যমে সুচতুরভাবে খাটায়। এখন ভাবুন কেন এতসব সাংবাদিক তাঁর পিছনে ধাওয়া করে, তাঁর হয়ে নিলামে অংশ নেয়, তাঁর নির্দেশ মতো সংবাদ পেশ করে, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এমন সব বিষয়গুলিও তাঁর নির্দেশিত পথে করে থাকে। এঁরা কেউই সাধারণ সাংবাদিক নয়, এঁদের অনেকেই নামজাদা কাগজের সম্পাদক পর্যন্ত। সুতরাং অনুমান করা যেতেই পারে যে, দেশের সাংবাদিকতা কীভাবে কলুষিত হচ্ছে।

আমি বুঝতে পারি না যে, টাটা-র মতো গ্রুপের দিল্লিতে এমনসব লোকজনদের কেন দরকার হয় যদিও দিল্লিতে এদের পুরোদস্তুর অফিস রয়েছে। আমি বুঝি যে, কোয়েম্বাটুর বা নাগপুরের ছোট ছোট সংস্থার দিল্লিতে এইরকম দালালদের দরকার পড়ে, কিন্তু টাটাদের কেন? এর কারণ কি? দালালি একপ্রকার নোংরা ব্যবসা যেখানে কালো টাকা ব্যবহৃত হয় অথবা দিল্লির লোকেরা কি টাটা গোষ্ঠীর চেয়েও ক্ষমতাবান?

বিশ বছর আগে ভারতীয় অর্থনীতির শৃঙ্খলমুক্তি হয়। তথাকথিত লাইসেন্স, পারমিট যুগের অবসান ঘটে—অবশ্য এগুলি আমাদের বোঝানো হয়ে থাকে। সেই সময়ে নীরা রাদিয়ার মতো লোকজন ছিল না, যদিও সেইসময়ে কিছু সংস্থার অধীনে মাইনে করা কিছু সাংবাদিক ছিল। তারা প্রত্যেকেই পরিচিত ছিল এবং এরা এই যোগাযোগের কাজগুলি করত। অবশ্য সেই সময়ে তাদের এমন কেতাদুরস্ত নাম ছিল না। কিন্তু কুড়ি বছর বাদে ছবিটা বদলে গেছে। পূর্বতন এইসব দালালি চক্রে যুক্ত ছিল কেবল পুরুষ, কিন্তু বর্তমানে এই পেশায় যুক্ত হয়েছে মহিলারাও। এইসব যোগাযোগকারীরা বড় বড় কর্পোরেট সংস্থার কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে।

আমার ধারণা যে, বিভিন্ন মন্ত্রী, আমলাদের যে উৎকোচ বাণিজ্যিক সংস্থা পাঠায় তা সরাসরি তাদের কাছে যায় না। নগদ অর্থ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় মধ্যস্থকারীরা মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। সুতরাং বদলায়নি কিছুই। টেবিলের নীচে দিয়ে যেসব লেন-দেন হয়ে থাকে তা এই মধ্যস্থকারীদের মাধ্যমেই করে থাকে কর্পোরেট সংস্থাগুলি। লাইসেন্স ও পারমিট রাজ বদলে গেছে লাইসেন্স এবং দালালি-রাজে। এখন এই দালালদের ভূমিকা অতীতের মধ্যস্থকারীদের থেকে অনেক বেশি সক্রিয়। প্রকৃতপক্ষে কিছুই পরিবর্তন হয়নি। ফরাসী প্রবাদ মতে, যতই পরিবর্তন হোক না কেন ততই তারা একই থাকবে।

এখন সকলেই তাদের দর বাড়িয়ে দিয়েছে। এরমধ্যে সাংবাদিকরাও আছে যারা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের দক্ষিণাও বাড়িয়েছে। এসব কিছুই তাদের ও তাদের বিবেকের লড়াই। কিন্তু আমার মতো সাধারণ পাঠকের অবস্থান কোথায়? যখন কোনও পরিচিত লেখকের প্রতিবেদন পড়ব তখন কি আমি তাঁকে বিশ্বাস করব নাকি তাঁর কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দেব। দেখুন, এইসব প্রতিবেদকরা দুর্নীতি নিয়ে লিখছে যাদের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক নেতা, বাবু, তাদের দোসররা এবং এরা তাদেরকে এবিষয়ে দায়ী করছে। আবার যাদের বিরুদ্ধে এরা কলম ধরছে, তারাই আবার এইসব হাই-ফাই মহিলাদের কাছ থেকে উৎকোচ নিচ্ছে। তাহলে কলম- লিখিয়েদের বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায় এবং আধুনিক সাংবাদিকতার পেশা হিসেবেই বা বিশ্বাসযোগ্যতার রইল কী? ঈশ্বর সবাইকে বাঁচান! *(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)*

অদ্ভুত রকম

দিক্‌চক্রবাল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চামানপুরা গ্রামের চন্দ্রকান্ত সিংকে চেনেন কি? ঠোঁট উলটে না বলার কিছু হয়নি মশাই! পৃথিবীশুদ্ধু সব লোককেই যে চিনতে হবে এমন কেউ মাথার দিব্যি দিয়েছে না কি? তবে কি না চামানপুরার চন্দ্রকান্তকে চিনে রাখলে কাজের কাজ হোত। মানে বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে ইনি বিলক্ষণ পড়িয়ে যেতে পারতেন। গৃহশিক্ষক বলে নাক সিঁটকোচ্ছেন নাকি? কিংবা ভাবছেন চামানপুরাটা আবার কোথায় রে বাবা! সপ্তসাগর পার থেকে ইনি কোন্ কাকাতুয়া বুড়ো এলেন যে খামোকা কাতুকুতু খেতে হবে বাড়ির কচিকাঁচাদের?

বিহারের চামানপুরায় চন্দ্রকান্ত সিং পরিচালিত স্কুল। ইনসেটে চন্দ্রকান্ত।

চামানপুরা সপ্তসাগর পারের মতো একেবারেই দুর্গম, একথা বলবো না। তবে সেটি দেশের বেশ প্রত্যন্ত প্রান্তে। বিহারের গোপালগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। অজ-গ্রাম বলাই যেতে পারে। ইলেকট্রিসিটি পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। এই গণ্ডগ্রামেই থাকেন প্রাইভেট টিউটর চন্দ্রকান্ত।

চটে গেলেন বুঝি? ভাবছেন অতদূর থেকে এখানে এসে পড়ানোর কথা বলে মশকরা করছি? মোটেও না। চামানপুরা গ্রামে গেলে দেখতে পাবেন একটি নির্মীয়মান স্কুল ভবন। আর তাতে বিহারের তিনটি জেলা যথা—ছাপরা, সিওয়ান এবং গোপালগঞ্জের ৫০টি গ্রামের অন্ততঃপক্ষে শ'পাঁচেক ছেলেমেয়ে নিতান্ত মাইল পনেরো ঠেঙিয়ে ক্লাস করতে আসছে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রকান্ত ছাড়াও দূর-দূরান্তের বহু শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন এই কচি-কাঁচাদের। ঘাবড়ে যাবেন না কিন্তু। বিদ্যুতহীন চামানপুরা গ্রামে কম্পিউটারের অন লাইন পরিষেবার মাধ্যমে কয়েক শত মাইল দূর থেকে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের পাঠ দিচ্ছেন। গোটা দু'য়েক বিশালাকৃতি জেনারেটর কম্পিউটারগুলোকে পাওয়ার যোগাচ্ছে। তবে হরকরকম্বা গোছের যখন-তখন ছাত্র কিংবা শিক্ষকেরা আসবেন-যাবেন, তেমনটি হবার যো নেই। বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রীতিমতো ঘটা করে 'অ্যাটেনড্যান্স' পর্যন্ত দিচ্ছেন টিচারেরা। আসলে ফিঙ্গারপ্রিন্টারের মাধ্যমে আঙুলের ছাপ দিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন তাঁরা। অপরদিকে ছাত্ররা কম্পিউটারে তাদের উপস্থিতি 'লগ' করছেন। আর এসবেরই মূল কারিগর হলেন ৩৫ বছরের চন্দ্রকান্ত সিং।

সিওয়ানের ডি এ ভি কলেজের স্কলার চন্দ্রকান্ত সিন্দ্রির বি আই টি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে বি টেক করেন। পরে বোম্বে আই আই টি থেকে এম টেক পাশ করেন। টাটা স্টীলের হয়ে জার্মানীতে বহুদিন কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরের জেনারেল মোটরস কোম্পানীতে রয়েছেন। তবে এর মাঝেও 'কারিগরী শিক্ষা সমৃদ্ধ বিশ্বমানের শিক্ষা' প্রদানের ব্যাপারে এককথায় অঙ্গীকারবদ্ধ তিনি। আর একাজের জন্য বিহারের প্রত্যন্ত এলাকার চামানপুরা গ্রামকেই বেছে নিয়েছেন তিনি। যেখানে বিদ্যুৎ পর্যন্ত পৌঁছোয়নি সেখানে অত্যাধুনিক টেকনোলজি পৌঁছে দিয়ে 'শিক্ষা'র ক্ষেত্রেই একটা 'বিপ্লব'-ই এনে দিয়েছেন তিনি। যার শরিক করেছেন নিজের রাজ্য বিহারকে। বিহার সরকারকে দেখেই কি চন্দ্রকান্তের এই সিদ্ধান্ত? হয়তো বা।

ভারতে অস্থিরতা তৈরির কৌশল

বিনায়ককে নির্দোষ প্রমাণে মরিয়া বিদেশী শক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ যে সকল ভারতীয় তথাকথিত বামপন্থী বলে পরিচিত তাদের একটা জায়গায় দারুণ মিল আছে। আর তা হলো, এদেশের প্রচলিত আইন ও বিচারব্যবস্থাকে অবমাননা করা, বিচারকের রায়কে নস্যাৎ করে বিচারককেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। অবশ্য যদি বিচারের রায় তাদের পক্ষে যায় তাহলে অন্য কথা। তা সেই বামমার্গীরা রাশিয়া, চীন অথবা কিউবার— যে কোনও দেশেরই অনুগত হোক না কেন। এমনটাই ঘটেছে বিনায়ক সেনের ক্ষেত্রে। একসুরে গলা মেলাচ্ছেন বৃন্দা কারাত থেকে তাবৎ ছোট, বড়, মেজো-সেজো স্বঘোষিত-অঘোষিত বামপন্থী নেতা-নেত্রী এবং বুদ্ধিজীবীরা। তবে, এঁরা যদি আইনের ডিগ্রি নিয়ে কালোকোট গায়ে আদালতে দাঁড়াতেন তাহলে আরও সুবিধা করতে পারতেন। সে চেষ্টা এখনও করতে বাধা নেই। কেননা, ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় অন্তত:পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের সবরকম পথই খোলা রয়েছে, চীন বা সাবেক রাশিয়ার মতো একেবারে ভ্যানিস বা হাপিস করার মতো ব্যাপার এদেশে খুব একটা হয় না।

বিনায়ক সেনের পুরো পরিচয় কি? তিনি কি শুধুই সেবাব্রতী? শুধুই কি জনজাতিদের সেবা করার জন্য কলকাতা-কল্যাণীর বাসস্থান এবং মা-বাবাকে ছেড়ে ছত্তিশগড়ের জঙ্গলে ডেরা বেঁধেছেন? 'ইলিনা' নামটা বিনায়কের পাশে কি একটু বেমানান ঠেকছে না?

সংবাদসূত্রে জানা গিয়েছে, বিনায়ক সেন এবং তাঁর সঙ্গেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত নারায়ণ সান্যাল চারু মজুমদারের (নকশাল আন্দোলনের অন্যতম সূত্রধর) সহযোগী ও রণনীতি নির্দ্ধারক। একই সাজাপ্রাপ্ত তৃতীয় ব্যক্তি হলেন পীযূষ গুহ। বিগত ২৪ ডিসেম্বর, ২০১০ রায়পুরের জেলা ও দায়রা জজ বি পি বর্মা প্রায় একশ পাতার রায় দেন। তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদির চুলচেরা বিশ্লেষণ, আসামীপক্ষের উকিলদের সঙ্গে দীর্ঘ যুক্তি-তর্ক-এর পরই বিচারপতি আসামীদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

রায়দানের পরই নকশালপন্থী মাওবাদীরা ছত্তিশগড়ে তীব্র ও হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রেললাইন উড়িয়েছে, বস্তার থেকে খনিজ পদার্থবাহী ট্রাক জ্বালিয়ে, নিরাপত্তারক্ষীদের প্রতি আক্রমণ বাড়িয়ে, মাওবাদীদের সঙ্গে সামিল না হওয়ার অপরাধে বনবাসী-জনজাতিদের হত্যা করতে শুরু করেছে। মহারাষ্ট্র লাগোয়া রাজনন্দনগাঁও-এর এক ছোট ব্যবসায়ীকে হত্যা করেছে এমন একটা সময়ে যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম্ মাওবাদী প্রভাবিত গড়চিরেলি জেলায় সফরে গিয়েছিলেন।

নকশালপন্থী তথা মাওবাদীরা গত ২ জানুয়ারি থেকেই বস্তারসহ তাদের প্রভাবাধীন এলাকায় অনির্দিষ্টকালীন বনধ্ ঘোষণা করেছে। ব্যাপকহারে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযান চালু করেছে। কয়েকজন পুলিশকর্মী সংবদ্ধ মাওবাদীদের হাতে মারা গেছেন। গোয়েন্দা সূত্র মতে, মাওবাদীরা ছত্তিশগড়ের সুকনার জঙ্গলে মতোই আরও একটি হামলা চালানোর ফন্দি আঁটছে। আগের ওই হামলাতে সত্তরজন জওয়ান শহীদ হয়েছিলেন। এবারও মাওবাদীরা তাদের নীতি-নির্দ্ধারকদের সাজা হওয়ায় প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত, উল্টে উচ্চ আদালত বা হাইকোর্ট থেকে বেকসুর খালাস করার দাবী জানাচ্ছে। নকশালী বা মাওবাদীদের বিচারালয় তথা আদালত ইতিমধ্যেই ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রমণ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম্-এর ফাঁসির সাজা ঘোষণা করেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী বিচারধারার অনুগামী বহু আলোচিত বুদ্ধিজীবীরা, তথাকথিত মানবাধিকারবাদীরা, ইংরেজী সংবাদমাধ্যমের সেকুলার লেখক-সাংবাদিককুল এবং বামপন্থী রাজনীতিবিদরা রায়পুর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাদের এক রা— বিনায়ক সেন হিংসায় লিপ্ত হতে পারেন না। এই 'রা' সর্বস্ব আঁতেলদের যত চিন্তা কেবল বিনায়ক সেনকে নিয়েই। এর প্রধান কারণ হলো বিনায়ক সেনের আন্তর্জাতিক স্তরে জানাশোনা ও সম্বন্ধ। ওই সম্বন্ধের ব্যাপারে খবর বের করা বা মূলে পৌঁছানো ছত্তিশগড় সরকারের পুলিশ বা গোয়েন্দাদের কম্ম নয়। অনেক ব্যাপার আছে স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও সংবাদমাধ্যম যার অনুমানমাত্র করতে পারলেও স্বপক্ষে জোরালো প্রমাণ উপস্থাপিত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। সেজন্য আর এ ডব্লুউ-এর মতো গোয়েন্দা সংস্থাকে কাজে লাগাতে হবে।

বিনায়ক সেন

রায়পুর আদালতের রায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন যে সকল সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ প্রচলিত আইনকানুনে বিশ্বাস রাখেন (এদের সংখ্যাটাই সর্বাধিক) তারা বেশ খুশী এবং সন্তুষ্ট। দ্বিতীয়ত, যে সকল বনবাসী-জনজাতি পরিবার তাদের পরিজনকে মাওবাদী-নকশালী হিংসার ফলে হারিয়েছেন তারা এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। যে সকল নিরাপত্তাকর্মী মাওবাদী উন্মাদদের হাতে মারা গিয়েছেন তাদের পরিবারের লোকেরাও রায়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। তাদের বক্তব্য, যারাই মাওবাদীদের বিরোধিতা করেছে বা অসহমত পোষণ করেছে তাদেরকেই মাওবাদীরা যুক্তিতর্ক ছাড়াই প্রাণদণ্ড দিয়েছে। এসকল মানুষের আরও বক্তব্য— ওদেরকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে না কেন? সাধারণ মানুষের সহানুভূতি রয়েছে নিহত-আহত এবং তাদের পরিবারের প্রতি।

তৃতীয় একটি শ্রেণী কিন্তু এই রায়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। কারণ, তারা হলো সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে মাওবাদী একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংরক্ষক এবং সমর্থক।

কংগ্রেসের দুমুখো নীতি ঃ

বিনায়ক সেনের সমর্থকরা হাইকোর্টে আপীলের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাইছেন যার ফলে আপীলের রায় দেবার সময় বিচারপতিরা মানসিক চাপে থাকেন। এব্যাপারে ইতিমধ্যেই মার্কসবাদীরা (ডান ও বাম) ময়দানে নেমে পড়েছেন। কিন্তু কংগ্রেস এখনও সমর্থনের ব্যাপার একমত হতে পারেনি বলে খবর। নকশালী সন্ত্রাসের মোকাবিলায় কংগ্রেসের নীতি— দু'মুখো। কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী, যে গোষ্ঠীতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন— তাঁদের মতে মাওবাদী সন্ত্রাস দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ। আবার, দিগ্বিজয় সিং এবং তাঁর গোষ্ঠী আভাসে-ইঙ্গিতে জানান দেন— নকশালপন্থীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার দরকার। আর কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউ পি এ-এর চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী যিনি একইসঙ্গে কংগ্রেসের সভানেত্রী, তিনি এই ভয়াবহ সমস্যায় অর্থপূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করে আছেন। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার লাভ তুলছে মাওবাদীরা।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, নকশালবাদ বা মাওবাদ সেইসকল রাজ্যেই সর্বাধিক কেন যেখানে অকংগ্রেসী সরকার রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কংগ্রেসের যে সকল নেতা নকশাল বা মাওবাদের প্রতি উদার, তাঁরা এড়িয়ে চলেছেন কেন?

বামমার্গী বুদ্ধিজীবী এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সংবাদমাধ্যম এখন বিনায়ক সেনকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে যে উঠে পড়ে লেগেছেন তা কিন্তু অকারণ নয়। প্রকৃতপক্ষে বিনায়ক সেন সাজা পাওয়ায় সেইসব ব্যক্তিবর্গ ভীত যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও না কোনও সূত্রে মাওবাদীদের সঙ্গে যুক্ত। কিছু লেখক (ইংরেজী ভাষার) সাহিত্য বা শান্তির নোবেল পুরস্কারের প্রত্যাশী। যেভাবে বিনায়ক সেনের গ্রেপ্তার নিয়ে পাশ্চাত্যের এক বিশেষ মহল (যাদের মধ্যে প্রায় এক ডজন নোবেল পুরস্কার বিজেতা আছেন।) সক্রিয় হয়েছেন তার মুক্তির ব্যাপারে, দাবী করছেন মুক্তি দেওয়ার। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে বিনায়ক সেনের লম্বা হাত কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত। যেরকম হুলস্থুল পড়েছে, আর তথাকথিত মানবাধিকার-এর তল্পিবাহক ব্যক্তি ও সংস্থার কাছে যে পরিমাণ বিদেশী ধন আসে তাতেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়। এছাড়া নকশালীদের তোলাবাজিও এখন এক বড়মাপের অর্থসংগ্রহের মাধ্যম। এবং অনুমান অনুসারে মাওবাদী-নকশালীরা বছরে কমপক্ষে কুড়ি হাজার কোটি টাকারও বেশি 'তোলা' আদায় করে। বিনায়ক সেনকে হাইকোর্ট থেকে মুক্ত করানোর জন্য এত হৈ-চৈ-এর কারণ হলো অন্য সব 'বিনায়ক'-রা ভয় পেয়ে গিয়েছে। এঁরা বিভিন্ন মুখোশের আড়ালে মাওবাদীদেরকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক সহযোগিতা করে থাকে। এদের সবচেয়ে বড় ভয় হলো— যদি বিনায়ক সেনের যাবজ্জীবন দণ্ড বহাল থাকে তাহলে তাদেরও আইনের হাতে পড়তে হতে পারে। এজন্যই বিনায়ক সেনের বিরুদ্ধে সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণকে উড়িয়ে দেওয়ার যাবতীয় কুচেষ্টা অব্যাহত।

বিনায়কের সঙ্গে সম্বন্ধ ঃ

নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সি পি আই (মাওয়িস্ট)-এর পলিটব্যুরো সদস্য এবং দান্তেওয়াড়া জেল ভাঙার ঘটনার পরিকল্পনাকার, অনেক ব্যক্তি হত্যার সঙ্গে যুক্ত নারায়ণ সান্যালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং সম্পর্কও ছিল বিনায়ক সেনের। এ ব্যাপারে অনেক অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পুলিশের হাতে রয়েছে। নারায়ণ সান্যাল গ্রেপ্তার হওয়ার পর নিষ্ঠার সঙ্গে তার পরিবার-পরিজনদের দেখাশোনা করেছেন বিনায়ক সেন। ১ জুন, ২০০৭-এ মাওবাদীরা বস্তার এলাকার বিজাপুর জেল আক্রমণ করলে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। সে সময় অনেক গোপন নথিপত্র পুলিশের হাতে আসে। সেখানেও বিনায়ক সেন, তার পত্নী ইলিনা এবং সেন পরিবারের ঘনিষ্ঠ মিত্র নারায়ণ সান্যালের নাম রয়েছে। নারায়ণ সান্যাল ২০০৫-এর ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রিতে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ রায়পুরের ডঙ্গনিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছিল। তখনই জানা গিয়েছিল যে, যে বাড়িতে ভাড়ায় থাকেন নারায়ণ সান্যাল— তারও ব্যবস্থা করেছেন বিনায়ক সেন। তিনি বাড়িওয়ালাকে বলেছিলেন, নারায়ণ তার আপন শ্যালক (সম্বন্ধী)। অন্য এক অভিযানে পুলিশ নকশালদের জন্য পাঠানো আগ্নেয়াস্ত্রের এক চালান উদ্ধার করেছিল।

(এরপর ৭ পাতায়)

সিদ্দিকুল্লার সফরের পর উদ্বেগ কোচবিহারে

পার্থ বর্মা ॥ মুসলিম নেতা সিদ্দিকুল্লার ঝটিকা সফরে কোচবিহার জেলার রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হলো। গত ১১ জানুয়ারি কোচবিহার শহর সংলগ্ন হরিপাড়ায় গোপন বৈঠকে মুসলিম নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী মিলিত হন। কোচবিহার সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপান-উতর শুরু হয়েছে। মুসলিম নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর কোচবিহার সফর সংখ্যালঘুদের কাছে একটা বিশেষ মাত্রা এনে দিয়েছে। স্থানীয় এক মুসলিম নেতার কথায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে সারা বাংলায় দলীয় কর্মী, সমর্থকদের চাঙ্গা করতেই এই সফর। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে এই জেলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেকটাই নিচে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চালু করা প্রয়োজন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান। ১৭ জানুয়ারি কলকাতার মেট্রোচ্যানেল জনসভায় কোচবিহার জেলার কয়েক হাজার পি ডি সি আই সদস্য অংশ নেয়। সেখানে ৫০,০০০ হাজারেরও বেশি সমর্থককে জমায়েত করে।

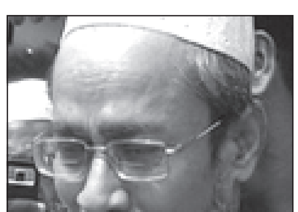

সিদ্দিকুল্লা এই সফরকে ঘিরে ঘোর প্রশাসনিক ব্যর্থতা সামনে চলে এসেছে। সিদ্দিকুল্লার আগমনের বার্তা ছিল না গোয়েন্দা বিভাগ তথা প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৬০/৭০ জন প্রার্থী দিয়েছে পি ডি সি আই। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের তিনটি আসনে প্রার্থী দেবে পি ডি সি আই। তবে কোন কোন বিধানসভায় প্রার্থী দেবেন তা জানাননি পি ডি সি আই নেতৃত্ব। একটি সূত্র বলছে রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতেই প্রার্থী দেবে পি ডি সি আই। তাঁরা আশঙ্কা করছেন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সৌজন্যে অসমের মতো পশ্চিমবঙ্গেও আগামী দিনে রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারক হবে পি ডি সি আই।

বিষ মদের ব্যবসা বাড়ছে মালদায়

তরুণ কুমার পণ্ডিত ॥ মালদা জেলা জুড়ে বেআইনী মদের ব্যবসা বৃদ্ধি ও বিষ মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া মদ খেয়ে খুন, জখম, ধর্ষণ ও অপরাধ প্রবণতাও ক্রমশ জেলায় বাড়ছে। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, হরিপুর, পুরাতন মালদা, ইংলিশবাজার প্রভৃতি ব্লক চোলাইয়ের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। এইসব এলাকাতে স্পিরিটের আমদানি কমে যাওয়ায় এখন ব্যাটারির অ্যাসিড দিয়ে দেশি মদ তৈরী হচ্ছে। ফলে বিষ মদ খেয়ে প্রতিদিনই অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ইংলিশ বাজার শহরে পানের দোকান, ফুচকাওয়ালা ও ডিম বিক্রি করার দোকান থেকে দেদার চোলাই দেশি মদ বিক্রি হচ্ছে। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা হরিপুর, পুরাতন মালদা, গাজোলের বিভিন্ন গ্রামে অনেকে বাড়িতেই বেআইনীভাবে দেশি মদ তৈরি করে থাকে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

মদের দোকানদারদের কথায়— চাহিদা অনুসারে মদের জোগান দিতে না পারার জন্য ব্যাটারির অ্যাসিড দিয়ে মদ তৈরীর প্রবণতা বাড়ছে। হরিশ্চন্দ্রপুরে ও ইংলিশ বাজারের গ্রাম এবং শহরের সর্বত্র জিনিসের আড়ালে বিক্রি হচ্ছে দেশি, বিদেশি মদ। সারাদিন কাজ কর্ম করে যেটুকু রোজগার হচ্ছে সেই টাকা দিয়ে বিষ মদ পান করছেন গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষরা। মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, পারিবারিক গণ্ডগোল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। সমস্ত বিষয় নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পঞ্চায়েত পুলিশ প্রশাসনকে অভিযোগ জানিয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন। গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে বিষ মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে। কয়েক বছর আগেই দোলের সময় ইংলিশবাজার থানার মহদিপুরে বেশ কয়েকজন বিষ মদ খেয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

তবে আশার কথা পুলিশ প্রশাসন যেখানে মদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছেনা সেক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মহিলার সমবেত ভাবে লাঠি ঝাঁটা উচিয়ে বেআইনী মদের ঠেকগুলিকে ভাঙতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গ্রাম ও শহরগুলিতে হিন্দুদের উৎসবকে কেন্দ্র করে যেভাবে যুবক যুবতীরা নেশায় মত্ত হয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে লিপ্ত হচ্ছে তা উদ্বেগজনক।

ডাল মে কুছ কালা হ্যায়

বিনায়ক-পত্নী ইলিনার ‘মুসলমান বন্ধু’দের জন্য গর্ববোধ কেন?

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ছত্তিশগড় আদালত সমাজসেবী এবং মানবপ্রেমী বিশিষ্ট ডাক্তার বিনায়ক সেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে। আইন ব্যবসায়ীদের কথার মারপ্যাঁচ এবং কূটকচালিতে অনেক সময় নির্দোষও দোষী হিসেবে শাস্তি পেয়ে থাকে। তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মতো শাস্তি উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে সিঙ্গুরে তাপসী মালিককে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগে চন্দননগর আদালত অপরাধীদের জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে রায় দিলেও কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে অপরাধীরা জামিনে মুক্ত হয়ে যায়। ছত্তিশগড় আদালতের রায়ে ডাঃ বিনায়ক সেনের স্ত্রী ইলিনা সেন ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন সরকার তাঁকে আই এস আই-এর চর বলতে চেয়েছে। তিনি আদালতকে জানান তাঁর অনেক মুসলমান বন্ধু আছেন। দেশে হয়তো মুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা বেআইনি হতে পারে, তবে তিনি ও তাঁর স্বামী এজন্য গর্ব বোধ করেন। তাঁকে বিদেশী চর বলায় তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন... ইত্যাদি (দৈঃ স্টেঃ ৬.১.১১)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনও বিশিষ্ট বা খ্যাতনামা ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকা সে হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান বা যে কোনও ধর্মেরই হোন না কেন, গর্বের বিষয় হতে পারে। তবে শুধু মুসলমান বন্ধু থাকাটা গর্বের বিষয় হবে কেন? ইলিনা সেন মহাশয়ার কি জানা আছে কোনও প্রকৃত মুসলমান কোনও অমুসলমানের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না? প্রয়োজনে বন্ধুত্বের ভেক্ ধরতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু? নৈব নৈব চ। প্রসঙ্গক্রমে এখানে কুরআন শরিফের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা— (১) অবিশ্বাসীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (সুরা ৪, আয়াত ১০১)। এখানে অবিশ্বাসী তারা যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না, অর্থাৎ অমুসলমান, (২) হে বিশ্বাসীগণ তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের বিভ্রান্ত করতে ত্রুটি করবে না, যা তোমাদের বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। (সুরা ৩, আয়াত ১১৮), (৩) অতএব আল্লাহ্‌র পথে গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য হতে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদের যেখানে পাবে গ্রেফতার করবে এবং তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু ও সহায়করূপে গ্রহণ করবে না। এ ধরনের বাণী বা নির্দেশ কুরআন শরিফে আরও অনেক আছে। একজন প্রকৃত মুসলমান কখনই পবিত্র কুরআন-এর নির্দেশ অমান্য করতে বা উপেক্ষা করতে পারে না। তবে প্রয়োজনে অমুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে পারে। তবে

বিনায়ক সেনের মেয়ে প্রাণহিতা (বাঁ দিকে) এবং স্ত্রী ইলিনা।

ইতিমধ্যে শ্রীমতি ইলিনা সেন এবং তাঁর স্বামী ডাঃ বিনায়ক সেন এবং তাদের ২০ ও ২৫ বছরের দুই কন্যা যদি ইস্‌লাম গ্রহণ করে থাকেন বা ইসলাম গ্রহণের অঙ্গীকার করে থাকেন তা হলে অবশ্য অন্য কথা। মনে হয় সেটাই ঘটেছে, তাই এত মুসলিম প্রীতি! তবে ওনার কি জানা নেই ইসলাম কবুল করা খুবই সহজ তবে ত্যাগ করা খুবই কঠিন। কেউ ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে মুরতাদ ঘোষণা করা হয় এবং এটি বধযোগ্য অপরাধ। কোনও মুসলিম তরুণী বা কিশোরী যদি ইসলামের বিধান অমান্য করে অর্থাৎ যদি হিজাব না পড়ে বা অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথা বলে বা টি.ভি.-তে গান করে তাহলে তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হয়। যেমন এ্যাসিড্ দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেওয়া, জীবন্ত অবস্থায় কবর দেওয়া বা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হয়। একে বলা হয় অনার কিলিং।

মুসলমানদের নৃশংসতা বা পৈশাচিক বর্বরতা শ্রীমতি ইলিনা সেন মহাশয়ার অজানা থাকার কথা নয়। তাহলে এত মুসলিম প্রীতি কেন? ৭১১ খৃঃ মহম্মদ বিন কাশিম-এর সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ থেকে শুরু করে সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, তৈমুর লং, বাবর, নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালী প্রভৃতি মুসলমান আক্রমণকারীরা এবং ভারতের শাসন ক্ষমতার সুলতান এবং বাদশাহরা যে নারকীয় অত্যাচার করেছিল লক্ষ লক্ষ হিন্দু হত্যা করে, সহস্র সহস্র হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে, হিন্দু রমণীর সম্ভ্রমহানি এবং সতীত্বনাশ করে দাস বাজারে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রী যদি শ্রীমতি ইলিনা সেন মহোদয়ার অজানা থাকে তাহলেও ১৯৪৬ সালে Direct Actio-এর নামে কলকাতায়, নোয়াখালিতে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে মুসলমানরা যে তাণ্ডব শুরু করেছিল তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায় লিওনার্ড মোসলের Last days of British Raj গ্রন্থে। তাঁর লেখনীতে "...৬০০০০০ of then were killed, but no, not just killed, it they were children they were kicked up by the feet and their heads smashed against the wall. If they were girls they were raped and their breasts were chopped of, and if they were pregnant they were disembowelled." এটা পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর সামান্য বিবরণ। কলকাতা আর নোয়াখালির ঘটনা অন্যরকম ঃ শত শত সশস্ত্র মুসলিম গুণ্ডা আল্লা হু আকবর ধ্বনি দিতে দিতে বাড়ী ঘিরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, বাড়ীঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে, বাড়ী থেকে লোকজন বেরিয়ে এলে তরোয়ালের কোপ্ মারছে, লাঠির বাড়ি মারছে। কারও আদরের কন্যা বা পুত্রবধূকে টানতে টানতে নিভৃত স্থানে নিয়ে যাচ্ছে, অসহায় পিতামাতার কানে কন্যা বা পুত্রবধূর কাতর আর্তনাদ পৌঁছচ্ছে কিন্তু দানবদের সামনে কিছু করার নেই। এত কিছুর পরেও যারা বলে মুসলমান বন্ধুদের জন্য গর্ববোধ করি তখন বুঝতে হবে 'ডালমে কুছ কালা হ্যায়"।

বিনায়ককে নির্দোষ প্রমাণে মরিয়া বিদেশী শক্তি

(৬ পাতার পর)

সেই ঘটনায় একজন যুবক এবং তার বাবা প্রফুল্ল ঝা-ও গ্রেপ্তার হয়েছিল। ওই প্রফুল্ল ঝা-কে বিনায়কের সহযোগী বলেই সাধারণ মানুষ জানতো।

নারায়ণ সান্যালকে বস্তারে মাওবাদী-নকশালী নেটওয়ার্কের ব্যাপারে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যেই দান্তেওয়াড়া জেলে কয়েদ রাখা হয়েছিল। জেলের নজরদারিতে সান্যাল কর্তৃক অন্য নকশালী বাদীদের এবং তাদের কাছে যারা দেখা করতে আসত তাদেরকে উস্কানোর ঘটনা ধরা পড়ে। তখন তাকে রায়পুরের কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীরা বুঝতেই পারেনি, দান্তেওয়াড়া জেলে নারায়ণ সান্যাল কি কারিকুরি করে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ২০০৭-এ ১৫০ জন মাওবাদী বন্দী জেল ভেঙে পালিয়ে যায়। চার্জশীটে পুলিশ ২০০৩ থেকেই নারায়ণ সান্যাল ও বিনায়কের ঘনিষ্ঠতার অনেক তথ্যপ্রমাণ জমা দিয়েছে। এতদিনে সবাই একথা জেনে গিয়েছেন যে, বিনায়ক সেন রায়পুর স্থিত কেন্দ্রীয় কারাগারে নারায়ণ সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে ৩৩ বার রায়পুর গিয়েছিলেন। সান্যালের কিছু সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা চিঠিপত্র নকশালী-মাওবাদীদের কাছে পৌঁছানোর অভিযোগও রয়েছে বিনায়ক সেনের বিরুদ্ধে। ১৯৭৭ থেকেই নকশালদের পলিটব্যুরো সদস্য নারায়ণ সান্যালের উপর অঘোষিত দায়িত্ব বর্তেছিল ছত্তিশগড় এলাকায় নকশালপন্থী কার্যকলাপ প্রসারের। পুলিশের মতে, বিনায়ক নারায়ণ সান্যালের নির্দেশ বিভিন্ন ঠিকানায় পৌঁছাতেন। পীযূষ গুহ-র কাছ থেকে এরকম তিনটি নির্দেশপত্র পুলিশ উদ্ধার করেছে যা বিনায়কই পৌঁছে দিয়েছিলেন। পীযূষ গুহ স্বয়ং আদালতে একথা স্বীকার করেছেন। এরকম অন্য আর একটি নির্দেশপত্র বিনায়ক বিলাসপুর নিয়ে যাওয়ার পথে ২০০৭-এর মে মাসে হাতে-নাতে ধরা পড়েন। ওখানের তারবাহার থানা থেকেই রায়পুর পুলিশকে তা জানানো হয়েছিল। আন্তর্জাতিকস্তরে বিভিন্ন যোগাযোগ ছাড়াও ছত্তিশগড়ের প্রায় সব জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে এন জি ও-র নাম নিয়ে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তিনি নিজেকে সরল জীবনযাপনকারী সেবাপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে এক ভাবমূর্তি গড়ে তুললেও সুযোগ পেলেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে নকশালী-মাওবাদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন এবং নিরাপত্তাবাহিনীর নকশাল-মাওবাদীদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের সমালোচনা করতেন।

চিকিৎসক বিনায়ক সেন ঃ

নিজের সমর্থকদের দিয়ে তিনি দীন-দুঃখী-দরিদ্রদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা ডাক্তারের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে স্টেথোস্কোপ বা ডাক্তারী-ব্যাগ নিয়ে ঘোরাফেরা করতে কখনও দেখা যায়নি। কোনও সংবাদপত্র বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাঁর চিকিৎসারত কোনও ছবি প্রকাশিত হয়নি। তাঁর কোনও চেম্বারে বা ডিসপেনসারির ঠিকানাও কারও জানা নেই। তাঁকে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ বলা হোত। তাঁর চিকিৎসকের ডিগ্রি অবশ্যই ছিল। হতে পারে যে, তিনি নকশালী-মাওবাদীদের চিকিৎসা করতেন। কিন্তু নকশালী-মাওবাদী হামলা ও সন্ত্রাসে যে সকল গরীব জনজাতি পরিবারের সদস্যরা হতাহত হয়েছেন, সন্ত্রাস দমন পীড়নে নিগৃহীতদের বাড়ির শিশু-বালক-বালিকাদের কাউকেও চিকিৎসা করতে তাকে কখনও দেখা যায়নি। যে সকল অত্যাচারিতদেরকে বস্তার জেলার চারটি প্রধান কেন্দ্র ছাড়াও রায়পুর, দুর্গ, ভিলাই, রাজনন্দনগাঁও, ধামতরি এবং আশপাশের কয়েকটি জেলাতে ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। তাদেরকে একবারের জন্যও দেখতে বা চিকিৎসা করতে যাননি বিনায়ক সেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে, তিনি তাহলে কাদের ডাক্তার?

ছত্তিশগড় সরকার ছাড়াও কস্তুরবা আশ্রম, গায়ত্রী পরিবার, সরস্বতী সংস্থান, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওই হতভাগ্য অবোধ বালক-বালিকাদের লালন পালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা বিগত চার-পাঁচ বছর যাবৎ করে আসছে। বনজঙ্গল এলাকায় গ্রাম থেকে আসা প্রায় আড়াই হাজার অনাথ জনজাতি শিশু রয়েছে যাদের অভিভাবকদের মাওবাদীরা হত্যা করেছে। বিনায়ক সেন ওই অনাথদের কখনওই কোনও খোঁজখবর করেননি। এমনকী আজ যারা বিনায়কদের হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন তারাও ওই হতভাগ্য বিতাড়িত উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করেননি। এসকল বাক্যবাগীশ বাণী বিতরণকারীদের বুদ্ধিভ্রষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ব্যতিরেকে অন্য কেউই গভীরভাবে গ্রহণ করেননি।

শীতকালেও পেঁয়াজ সহ সমস্ত আনাজপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি কেন ?

এন সি দে

ভারতবর্ষের প্রশাসনে দুর্নীতির জন্মদাতা কংগ্রেস। দুর্নীতি ও কংগ্রেস সমার্থক। ভারতবর্ষের মানুষমাত্রই জানেন কংগ্রেস ও তার সমগোত্রীয় দলগুলির জোট সরকার ২০০৪ সালে ক্ষমতা দখল করার পর থেকেই পুনরায় প্রতিটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যমূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তার সঙ্গে বেড়ে চলেছে প্রশাসনিক দুর্নীতির বহর। ইউ পি এ জোট সরকারের যে কোনও মন্ত্রীকে কোনও কাজের বরাত দেওয়া হলেই তা নিয়ে দুর্নীতি হবেই হবে। সুরেশ কালমাদী কমনওয়েলথ গেমস্-এর বরাত পেয়েই শুরু করে দিয়েছে পুকুর চুরি। অর্থমন্ত্রীর অধীন ব্যাঙ্কগুলিও ঋণদান প্রক্রিয়ায় করেছে ব্যাপক দুর্নীতি। টু জি স্পেকট্রাম বিলি বন্টনের বরাত পেয়েই টেলিকম মন্ত্রী চূড়ান্ত দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সরকারের কোটি কোটি টাকার লোকসান করেছে। ইউ পি এ সরকারের কোনও মন্ত্রীর অধীন মন্ত্রকই আজ দুর্নীতি মুক্ত নয়।

এই প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে বর্তমান কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস জোট সরকারের আমলের অস্বাভাবিক পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ইস্যুটিকে। রাষ্ট্রের বৈভব কিংবা অভাব নির্ভর করে রাষ্ট্রনীতির উপর। অপদার্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত, বিলাসপ্রিয় রাজার রাজ্যের প্রজাগণ কখনই সুখে থাকতে পারে না। আধুনিক রাষ্ট্রের দিক্‌নির্দেশ করে তার আর্থিক নীতি। আর্থিক নীতি যদি দেশের মানুষের স্বার্থে নির্ধারণ করা হয়, তবে তার প্রতিফলন ঘটে থাকে রাষ্ট্রের শিল্প, কৃষি ও ব্যাঙ্কিং পলিসিতে। রাষ্ট্রের আর্থিক পলিসি যদি দালাল পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হয়, তবে তা জাতীয় পুঁজির বিকাশের পথে অনুকূল কিছুতেই হতে পারে না।

একথা আজ মানুষের মুখে মুখে ফেরে যে বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলে যুদ্ধ, বন্যা, ভূমিকম্প, দাঙ্গা এবং মার্কিন অনুদানের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল ছিল। শুধু তাই নয় দেশ হয়েছিল ঋণমুক্ত। বাজেটে রাজনৈতিক দানছত্র দরে বিশাল আর্থিক ঘাটতি ঘটিয়ে তা পুষিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কংগ্রেস আমলে পালা করে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (আই এম এফ) প্রভৃতি বিদেশী সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে দেশকে বিদেশী ঋণের জালে যেভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তা রুখতে বাজপেয়ী সরকার জারি করেছিল ঠঁত্মচন্ত ট্রস্তব্ধ। উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে স্বনির্ভর শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা। বাজপেয়ী সরকার আরও একটি কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছিল তা হলো আমদানি কমিয়ে রপ্তানী বাড়িয়ে বিদেশী মুদ্রাভাণ্ডার পূর্ণ করা। আর হয়েছিলও তাই।

আমাদের বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডার পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছিল।

আজ এই কংগ্রেস আমলে সেসবই ইতিহাস হয়ে গেছে। বিদেশী-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানে এক বিদেশিনী-দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেস পুনরায় দেশকে বিদেশের তল্পিবাহকে পরিণত করছে। আজ দেশের বাজারের করুণ অবস্থা এবং কংগ্রেস সরকারের ভূমিকার কথাই এবার আলোচনা করব।

গত ১৮ ডিসেম্বর '১০ শেষ হওয়া সপ্তাহে খাদ্যদ্রব্যের মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ১৪.৪৪ শতাংশ। মাত্র তার আগের সপ্তাহেও ছিল ১২.১৩ শতাংশ। গত আড়াই মাসের মধ্যে এই হার সর্বোচ্চ। কিন্তু গত বছর এই সময়ে উঠে গিয়েছিল একেবারে ২১.২৯ শতাংশে। এই মুদ্রাস্ফীতির হার কিন্তু পাইকারি বাজারের হারের সূচক। শুধু মাত্র সবজির মিলিত মূল্যসূচক ধরলে এই হার হবে ২৮ শতাংশ। যদিও পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ হারে। ইউ পি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী (যিনি বেশির ভাগ সময় ক্রিকেট রাজনীতিতেই ব্যস্ত থাকেন) গ্রীষ্মে বলেন এর জন্য অনাবৃষ্টি দায়ী, বর্ষায় বলেন অতিবৃষ্টি দায়ী, আবার শীতে বলেন অসময়ের বৃষ্টি কিংবা বেশী ঠাণ্ডা বা কম ঠাণ্ডা দায়ী। বাংলায় প্রবাদ আছে যে নাচতে জানে না সে উঠোনকে দোষ দেয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি কিংবা অসময়ের বৃষ্টি, ঠাণ্ডা কম বা বেশির জন্য না হয় ভোগ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে। কিন্তু জ্বালানীর ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি কেন গত বছরের ৫.০৬ থেকে ডিসেম্বরে ১০.৭৪ শতাংশ হয়ে গেল। আসলে দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। বিদেশীদের তল্পিবাহক কংগ্রেসীদেরও ছলের অভাব নেই।

ইতিহাসের পাতা উল্টে আসুন— দেখবেন কংগ্রেসীদের এই ছলের ইতিহাস। ১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারত শাসনের ইতিহাসে মূল শাসক এই কংগ্রেস-ই। তাই আজকের করুণ ইতিহাসের দায় তাকে নিতে হবে। এই কংগ্রেসকেই দিতে হবে জবাব— কেন ২০০৩-০৪ আর্থিক বছরেও বিজেপি-জোটের এন ডি এ সরকারের শেষ বছরে কৃষিতে বৃদ্ধি যেখানে ছিল ১০ শতাংশ, কংগ্রেস-জোটের ইউ পি এ সরকারের ৫ বছরের শাসনে ২০০৮-০৯-এ এই বৃদ্ধি কমে কেন হলো মাত্র ১.৬ শতাংশ। ২০০৯-১০-এর বাজেটে সরকারের অর্থমন্ত্রীর হিসাবেই বলা এই বৃদ্ধি ০.২ শতাংশ কিংবা তারও নীচে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অর্গানাইজেশনের পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে এন ডি এ সরকারের শেষ বছরে অর্থাৎ ২০০৩-০৪ বর্ষে কৃষিতে বৃদ্ধির হার ছিল ১০ শতাংশ; ঠিক তার পরের বছরে ইউ পি এ সরকারের প্রথম বছরে অর্থাৎ ২০০৪-০৫ বর্ষে এই হার হয়ে যায় ০ শতাংশ। আর এই হারই তাদের আমলের ৫-৬ বছর পর দাঁড়াল— ০.২ শতাংশে। কারণ কী সত্যই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি?

১৯৮২ সালে প্রকাশিত 'ওয়ার্কিং গ্রুপ অন সেভিংস'-এর রিপোর্টে বলা হয়েছিল —ইদানীং দেখা যাচ্ছে কৃষিতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভাঁটা পড়েছে। সমস্ত দেশে পারিবারিক বস্তুনির্ভর সম্পত্তিতে বিনিয়োগের যে অংশ কৃষি-সম্পর্কিত সম্পত্তিতে হয় সেটি পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে বাড়তে বাড়তে ষাটের দশকের মাঝামাঝি ৩৬ শতাংশে ওঠে, তারপর থেকে সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত ওই অংকের নীচেই রয়েছে। অর্থাৎ কৃষি ও শিল্প বিরোধী বিজাতীয় কংগ্রেসী শাসনের কুফল সেই সময় থেকেই ফলতে শুরু করেছে। শিল্পের কথা এই কারণে বললাম —কারণ, আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে কৃষি এত বড় একটা জায়গা নিয়ে আছে যে এর শ্লথ (এবং অস্থির) গতি শিল্পের গতিকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। মোটামুটি হিসেব করে দেখা গেছে যে আমাদের দেশে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি যদি আর এক শতাংশ বেশী হয় তাহলে সমস্ত সরাসরি এবং পরোক্ষ ফলে শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি ০.৫ শতাংশ বাড়বে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ০.৭ শতাংশ বাড়বে।

দুঃখজনক হলেও সত্যি ঘটনা হলো কৃষিতে যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়নি তার প্রতিফলনই গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্যে ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে গত নভেম্বরে (২০১০)-এ পরিকাঠামো শিল্পে বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়িয়েছে ২.৩ শতাংশে। গত ২১ মাসে যা সর্বনিম্ন। গত অক্টোবরেও এই হার ছিল ৮.৬ শতাংশ; ২০০৯-এর নভেম্বরে ছিল ৫.৯ শতাংশ। সরকারী হিসাবে মূলতঃ পেট্রোলিয়াম পরিশোধন এবং সিমেন্ট শিল্পে সঙ্কোচনের কারণেই এই হ্রাস। আমার মতে, কৃষিতে বিকাশের হার কমলে সমস্ত মূল পরিকাঠামো শিল্পেই বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হবেই।

জাতীয় কৃষি ও শিল্পবিরোধী কংগ্রেসী শাসনের অপশাসনের ধারাবাহিক কারণেই আজ জাতীয় অর্থনীতি ক্রমেই বিদেশীদের কবলে চলে যাচ্ছে। খুবই পরিতাপের বিষয় হলো জাতীয় আয় বা জিডিপি-তে কৃষির অবদান ক্রমশই কমে চলেছে। ১৯৯১ সালে

(এরপর ১৪ পাতায়)

সবজির বাজারদর ও

গোপীনাথ দে

সবজির বাজার আগুন। কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েরই টাক পড়েছে। কিন্তু যে সব ব্যবস্থাগুলি সরকার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে তার সুফল এখনই আশানুরূপ ভাবে মিলছেনা। সমস্যার মূলে রয়েছে কৃষিপণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বিপণনের সুব্যবস্থা। উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জোগান যথেষ্ট না বাড়লে উপভোক্তাদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া কঠিন হবে। সমস্যার আশু সমাধানের জন্য, বিদেশ থেকে আমদানী এবং কিছু আমদানী শুল্ক ছাড়। একটা অস্থায়ী সমাধান হলেও;দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য কেন্দ্র সরকার একটি কমিটি গঠন করেছেন। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিংহ হুডা-কে সভাপতি করে পাঞ্জাব, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদের সদস্য করে হুডা কমিটি গঠিত হয়েছে। ওই কমিটি ইতিমধ্যেই কৃষি সংস্কারের সুপারিশ পেশ করেছেন।

সংস্কারের মূল বক্তব্য বাজারের স্বাধীনতা। কৃষিপণ্যের চলাচল, বাণিজ্য, মজুত, বিপণনে লগ্নি এবং রপ্তানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে যে বহুবিধ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তা তুলিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কমিটি। হুডা-কমিটির সুপরিশ মতো বাজারকে স্বাধীনতা দিলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন এবং বিপণন উৎসাহিত হবে এবং তাহার পরিণামে ফলন বাড়িবে। যে সব পণ্যের চাহিদা বেশি, সেগুলি উৎপাদনে কৃষক উৎসাহিত হবে। কৃষিপণ্য বিপণন করিয়া যে লাভ হয়, কৃষক তাহার ন্যায্য ভাগ পায় না। আমাদের দেশে কৃষককে বাজারদরের আশীর্বাদ নিতে দেওয়া হয় না। দেশের বাজারে নানা নিয়ন্ত্রণ; রপ্তানীতে বাধা, এমনকি কৃষি জমি কেনাবেচাতেও আইনি বাধা। অর্থাৎ উদার আর্থিক নীতি কৃষিক্ষেত্রে পৌঁছায়নি। অপরদিকে কৃষির পরিকাঠামো সম্প্রসারণে সরকারি বিনিয়োগ অতি নগণ্য ও সীমিত। বর্তমানে যে কৃষি নীতি চলছে তার আমুল পরিবর্তন আবশ্যক। কারণ এই কৃষি নীতি রাজনীতি নির্ভর। কৃষক স্বার্থে সর্বোপরি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে কৃষিনীতি প্রণয়নের প্রয়োজন।

পেঁয়াজের দাম আকাশ ছোঁয়া; দাম বাড়ছে আরও কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের। যখন পেঁয়াজের দাম দ্বিগুণ হয়ে গেল তখন কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ার নির্বিকারভাবে জানিয়ে দিলেন আগামী তিন সপ্তাহের আগে এই দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। অকাল বর্ষণের ফলে নাকি পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারপর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পেঁয়াজ রপ্তানী বন্ধ করিয়াছেন কেন্দ্র সরকার।

কেন্দ্র সরকারের নীতির ফলে প্রত্যেকটি জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, সদ্য বেড়েছে পেট্রোলের এবং ডিজেলের দাম। ফলে সমস্ত জিনিসের দাম আরও বাড়বে। মূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের উপর যে মারাত্মক চাপ পড়ছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করছে না কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকার।

শুধু পেঁয়াজ তো নয়;চাল, আটা, ডাল, দুধ, চিনি থেকে সবজি পর্যন্ত সব জিনিসেরই বাজারদর আগুন। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো আবার রেলের পণ্যমাশুল

বাড়াচ্ছেন রেলমন্ত্রী। ফলে জিনিসের দাম আরও বৃদ্ধি পেতে সহায়ক হবে।

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত"-এর যুগ থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় চার হাজার 'হাট'-এর ব্যবস্থা চলে আসছিল। এইসব হাটগুলিতে প্রধানতঃ সপ্তাহে দুইদিন মূলতঃ কৃষিপণ্যের ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। জমিদারী প্রথা বিলোপের ফলে ওইসব হাটগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে চলে আসে। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ওইসব হাটগুলি কৃষকবিক্রেতা ও ক্রেতার— সকলের স্বার্থ রক্ষার্থে একটি নীতি নির্ধারণ করেন। এবং সরকারের নীতি রূপায়ণের জন্য 'নিয়ন্ত্রিত বাজার' ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত

পরিত্রাণের একমেবাদ্বিতীয়ম পথ খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

এই লেখাটি লেখার সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার বাছাই সদস্য নিয়ে সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের পন্থা নিরূপণে আলোচনায় বসেছেন। সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী তছনছ করে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ২৫ ডিসেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহে ১৮.৩ শতাংশ। এটি এই শীতের মরসুমে মুদ্রা সুচকের উর্ধ্বগতির একটি সর্বকালীন রেকর্ড। কেন এমনটা হলো? দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারে অর্থনীতিবিদদের ছড়াছড়ি। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া এঁরা সকলেই স্বদেশে বা বিদেশে প্রশিক্ষিত অর্থনীতির পণ্ডিত বলে গণ্য। দেশের অর্থনীতিবিদদের প্রাথমিক কর্তব্যই হলো দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের রূপরেখা রচনা করা। আর তা করতে গেলে এই মুদ্রাস্ফীতি নামক দানবটির-আচার-আচরণ অনুধাবন করে তাকে আগে থেকেই বাগে আনার কলাকৌশল নিয়ে চর্চা করা। এঁরা কি করেছিলেন?

(১) প্রধানমন্ত্রী ভারতের মুদ্রাস্ফীতির হার ২০০৯ ডিসেম্বরের মধ্যেই ৬ শতাংশ হয়ে যাবে বলেছিলেন জুলাই ২০০৯-এ।

(২) অর্থমন্ত্রী মে ২০১০-এ বলেন এটি একটি চিন্তার বিষয় তবে এ নিয়ে অস্থির হবার মতো পরিস্থিতি আসবে না।

(৩) মন্টেক সিং আগস্ট ২০১০-এ বললেন ডিসেম্বর ২০১০-এর মধ্যেই মুদ্রাস্ফীতি স্বস্তিদায়ক জায়গায় চলে আসবে।

এই বক্তব্যগুলি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের যাদের পরিচালনা করেন দেশের অন্তরাত্মা তথা আম-আদমীর স্বঘোষিত প্রতিভূ। তাই তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে যা তিনি শুনতে চান তল্পিবাহকরা তাই শোনান। এদিকে আম আদমীর মুখ বাজারে মালপত্র কিনতে গিয়ে সকালে কালো জামের মতো হয়ে যায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

এঁদের এই পলিসি-ডিসিশনকে বাস্তবায়িত করবে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতিকে কাজে কর্মে বাগে আনবে কে? সেটি করবে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। তাঁর কর্তা ডুভুরি সুববারাও জুলাই ২০১০ বলেছিলেন মার্চ ২০১১-তে মুদ্রাস্ফীতি ৬ শতাংশে ঘোরাঘুরি করবে। ২৫ ডিসেম্বর, ২০১০-এ তা ১৮.৩ শতাংশ।

দায় কে নেবে?

Plato তাঁর Republic-এ বলেছিলেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ব্যর্থতায় জনগণের তাদেরকে বরখাস্ত করার অধিকার থাকবে। আমরা সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন নই। তাই আম-আদমীর জন্য কপট মুখ শুকনো করা ছাড়া তাঁরা বহাল তবিয়তেই থাকবেন। আমেরিকা তাদের মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্য আগে থেকে বাধ্যতামূলকভাবেই বেঁধে দেয়। তা ছাড়িয়ে গেলে Federal Governor-এর চাকরী নিয়ে টানাটানি হয়। কিন্তু এখানে RBI Governor নানা ব্যাখ্যা দেবেন। তাঁর চ্যালাচামুন্ডারা নানান প্যাঁচ পয়জার করতে আরম্ভ করেছেন। সেগুলি খুব সংক্ষেপে দেখা যাক।

প্যাঁচ-পয়জার

পেঁয়াজের খুচরো দামের কমা-বাড়া

রাজ্য	মূল্যমান ৬.১.১১	মূল্যমান ৮.১.১১	কমেছে শতাংশে
মহারাষ্ট্র	৭০	৬০	১৫
দিল্লী	৭০	৬০	১৫
তামিলনাড়ু	৬৫	৫০	২৩
পাঞ্জাব	৬৮	৫৫	১৯
হরিয়ানা	৬৮	৫৭	১৬
জম্মু-কাশ্মীর	৬৯	৫৯	১৫
গুজরাট	৭০	৩৫-৪৮	৩১
মুম্বাই	৮০	৫৫	৩১

সূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস্

cost push inflation—দেশের মৌল উপাদানগুলি—লৌহ আকরিক, কয়লা, তেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদির দাম বাড়লে তা চক্রাকারে অন্য সব উৎপাদিত বস্তুর দাম বাড়াচ্ছে। তুলনামূলক ভাবে মৌলের দাম বাড়েনি। Demand pull—লোকের হাতে মাইনে বাড়ার অনেক টাকা এসে গেলে হঠাৎ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যেতে পারে। তাতে পেঁয়াজ, টোমাটো, বেগুনের দামে হেরফের হয় না। Capital goods-এর দাম বাড়তে পারে— খাদ্যপণ্যের নয়। Cyclical-কোনও একটা সময়ে অর্থনীতির নিয়মেই এটা হয়। ২ বছর ধরে উর্ধমুখী ধারা তাতে বজায় থাকে না।

Seasonal-ঋতুর ওপর নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতি। শীতকালে শাক-সবজি, চাল, আলু, ডিম ফসলের দাম যে কমে তা আম-আদমী জানে। তাই এটিও অসার।

Structural-আঙ্গিকগতভাবে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা। যেমন কোনও

লোকের যদি মাংস সহ্য না হয় তা হলে মাংস খেলে তার শরীর খারাপ করবে। অর্থনীতিতে এমন কি ঘটেছে সেটা তাঁরা ইঙ্গিত দেননি।

Supply chain-এটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে মাল চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ হচ্ছে না। গুদামজাত হয়ে থাকছে। যেমন যেমন দাম আকাশ ছোঁয়া হচ্ছে, কিছু কিছু মুনাফাবাজ তা ছাড়ছে। এটা তো সর্বপ্রাচীন কারণ। এইসব বিষয়কে কেন্দ্র করে কত সাহিত্য, চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি। অমর্ত্য সেনের গবেষণা রয়েছে। পেঁয়াজ ৮০/১০০, টমাটো ৫০/৬০ যা হবার হয়ে গেছে। সরকার এখন ইনকাম ট্যাক্স বিভাগকে দিয়ে গুদামে গুদামে তল্লাসি চালাচ্ছে। ফল দেখুন— মহারাষ্ট্র, দিল্লী, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, জম্মু, কাশ্মীর, মুম্বাই, গুজরাট সর্বত্র পেঁয়াজের দর জানুয়ারি আট তারিখে ৩৫ থেকে ৫৫ টাকার মধ্যে নেমে এসেছে। বাকী রাজ্যগুলিতে তল্লাশি শুরু হবে। অন্যান্য পণ্যের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। এটা আগে চেষ্টা করা যেত না। না, তা করলে মজুতদাররা কামাতে পারত না। এখন মোটামুটি কামিয়ে নিয়েছে।

আম-আদমীর অন্নদাতা—

প্রশ্ন আসে বিজেপি জমানায় কি মজুতদার ছিল না? ছিল। তবে তখন মাথার ওপর ছিলেন বাজপেয়ীজী ও তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মন্ত্রীকুল। ছিল দেশবাসীর প্রতি দায়বদ্ধতা। বিসমিল্লায় যদি গলদ থাকে, তাহলে বিপদ। ২৩ বছর পরে সেই আয়কর দপ্তরই বলে যে অন্তরাত্মা-ঘনিষ্ঠ কোয়াত্রোচী ৪৩ কোটি টাকা বফর্সের ঘুষ নিয়েছিল। যে মামলা জোর করে ধামাচাপা দেওয়া হয়। রাতারাতি অন্তরাত্মাকে দেখে টেলিকমের রাজাবাবু শুরু করেছেন, কমনওয়েলথের সুরেশবাবু গুছিয়ে নিয়েছেন, আদর্শ গৃহ নির্মাণের চহ্বানবাবু পরিতৃপ্ত। মজুতদাররা নিঃশঙ্ক, নির্ভয়।

আবার আর বি আই

এই দিশেহারা পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ভাবছে 'রেট' বাড়াবে। এটা হচ্ছে সমস্ত সরকারী ব্যাঙ্ককে তাদের গ্রাহকদের জমার একটি অংশ সি আর আর বাধ্যতামূলকভাবে আর বি আই-এর কাছে রাখতে হয়। আর আছে এস এল আর, যেখানে ব্যাঙ্কগুলি সরকারী ঋণপত্রে বাধ্যতামূলক ভাবে জমা টাকার একটা অংশ রাখে। বর্তমানে সি আর আর ও এস এল আর শতকরা ৬ ও ২৪ ভাগ। এখন বাজারে টাকার যোগান কমাতে আর বি আই এগুলি বাড়াতে চাইছে। টাকার যোগান কমলে জিনিসপত্রের দাম কমবে। এটি হঠকারী সিদ্ধান্ত ছাড়া যে কিছুই নয় তা আর বি আই-ও জানে। হঠাৎ রেট বাড়িয়ে দিলে ব্যাঙ্কগুলি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এমনিতেই তাদের এখন নগদের যোগান কম। তাই রেট বাড়লে টাকার অভাবে তারা প্রতিশ্রুতি মতো গ্রাহকদের ঋণ দিতে পারবে না। শিল্প ও কৃষি উৎপাদন কমবে। ফল হবে ভয়াবহ।

বাকি কি?

পরিত্রাণ একটিই— খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা। যে 'রেড' শুরু হয়েছে বাঁচতে গেলে তা সব অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ওপর লাগু করা যেখানে শরদ পাওয়ারের মুখের দিকে তাকালে হবে না। আর দিগ্বিজয় মন্ত্রী হবার জন্য রাহুল বাবার সুরে সুর মিলিয়ে যে 'হিন্দু-সন্ত্রাস', 'আর এস এস' হটাও বলে ঘ্যান ঘ্যানে প্রলাপ বকছেন সেদিক থেকে নজর সরিয়ে সত্যি-সত্যিই দেশের আম-আদমীর কথা ভাবতে হবে, যাদের বাঁচাতে টু পাইস করার সুযোগ নেই। আর নেই বলেই মরীয়া হয়ে প্রথম সুযোগেই তারা পদাঘাত করবে।

পশ্চিমবঙ্গে সর্বমোট তেতাল্লিশটি (৪৩) নিয়ন্ত্রিত বাজার সৃষ্টি করেছেন এবং ওইসব নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলির অধীনে আরও কয়েকটি ছোট ছোট হাট একই পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও ওইরূপ নিয়ন্ত্রিত বাজারের মোট সংখ্যা মাত্র তেতাল্লিশ (৪৩) এবং হাটগুলি পূর্বের মতোই চলছে। কোনও নিয়ন্ত্রণের বালাই নেই কেবলমাত্র মালিকানার পরিবর্তন হয়েছে। আগে মালিক ছিল জমিদার বা ভূস্বামী। আর বর্তমানে মালিক পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি হলেও ওইসব হাটগুলির সংখ্যা কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করা হয়নি। সেই কারণে সাধারণ কৃষক-বিক্রেতারা সমৃদ্ধ গ্রামের মোড়ে মোড়ে রাস্তার ধারে মিনিহাট চালু করেছে। এইসব মিনি হাটগুলির সরকার পক্ষের কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও পার্টির ক্যাডার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ আছে এবং তারাই তোলা আদায় করে কে কোথায় বসবে বা কে কতটা জায়গা দখল করবে এসব সব ঠিক করে দেয়।

যে কথাটি নিয়ন্ত্রিত বাজার সরকার চালু করেছেন সেগুলিও আজ পর্যন্ত পরিপূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হয়নি এবং যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়ন্ত্রিত বাজার চালু করার প্রয়োজন হয়েছিল তা-ও পূর্ণ হয়নি। নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল— (১) কৃষক তার উৎপন্ন ফসলের লাভজনক দাম পাবেন এবং ক্রেতা সাধারণও ন্যায্য মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয় করবার সুযোগ পাবেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কৃষক যদি আলুর দাম চার টাকা প্রতি কেজি পান তবে তা কৃষকের পক্ষে লাভজনক হবে এবং ক্রেতা যদি ছয় টাকা হিসাবে আলুর কেজি পান তবে ক্রেতার পক্ষে তাহা সুবিধাজনক হবে। কিন্তু বাস্তবে যা হয়— কৃষক দুই টাকা কেজি প্রতি পায় আর ক্রেতারা তা আট টাকায় ক্রয় করেন; অর্থাৎ মাঝখানে পাইকার ও ডালাওয়ালা বা ব্যবসাদারেরা প্রচুর মুনাফা লোটেন। এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তদারকি করার জন্য যে কমিটি আছে; সেই কমিটিই দেখভাল করেন এবং ক্রেতা বাজারে বা হাটে প্রবেশ করিলেই; প্রবেশ পথের উপরে পণ্যমূল্যের তালিকা টাঙ্গানো থাকতে হবে; ক্রেতা সেটা দেখে নিতে পারেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত যে কয়টি নিয়ন্ত্রিত বাজার হয়েছে সেগুলির কোথাও কোনওদিন রোজের রোজ মূল্য তালিকা দেওয়া হয় না। যদি নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটি তার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করত তা হলে ক্রেতা সাধারণের বর্তমানে যে নাভিশ্বাস উঠেছে মূল্যবৃদ্ধির জন্য, তাতে কিছুটা হলেও নিরাময় হোত। নিয়ন্ত্রিত বাজারে একটি বহুমুখী হিমঘর থাকতে হবে। কারণ সব কৃষিপণ্যই যে রোজের রোজ বিক্রয় হয়ে যাবে এমন কথা নেই। পান, ফুল, মাছ ইত্যাদি যে সব পণ্য অবিক্রিত থাক; সেগুলি ওই হিমঘরে রাখার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওইসব নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলিতে বহুমুখী হিমঘর তৈরি হয়নি।

নিয়ন্ত্রিত বাজার গুলিতে একটি করিয়া গুদামঘর থাকিতে হবে; যেখানে বিক্রেতা তাহার অবিক্রীত মাল রেখে যেতে পারবেন এবং অভাবী কৃষক তার সবজী রেখে কয়েকদিনের জন্য বাজার কাছ থেকে কিছু পরিমাণ স্বল্পমেয়াদী ঋণ স্বল্পসুদে গ্রহণ করতে পারবেন সেই ব্যবস্থাও থাকতে হবে। তবেই নিয়ন্ত্রিত বাজারের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পাবে বা নির্দ্ধারিত লক্ষ্য পৌঁছনো যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার দীর্ঘ ৬৩ বৎসর পরেও রাজ্যের সব হাট ও বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত বাজারে রূপান্তরিত করা হয়নি; এবং যে সামান্য কিছু নিয়ন্ত্রিত বাজার করা হইয়াছে, সেগুলিকেও পরিপূর্ণ রূপদান করা সম্ভব হয়নি। সব হাট বাজারগুলিকে আদর্শ নিয়ন্ত্রিত বাজারে রূপান্তরিত করলে সবজির বাজারদর অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হতো।

বাংলাদেশি হিন্দুদের নাগরিকত্ব দাবি

সম্প্রতি (২৮.১২.২০১০) ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত মতুয়া মহাসঙেঘর ডাকে এক প্রতিবাদী সমাবেশে ডান-বাম সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ছিলেন উপস্থিত। মূলত বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবিতে ছিল এই সমাবেশ। সঙেঘর বক্তব্য ছিল একটাই—৭১ সালের পরে যেসব হিন্দু বাংলাদেশ ছেড়ে এদেশে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও আসবেন তাঁদের সবাইকে ভারতের নাগরিকত্ব দিতে হবে। কাউকেই অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশে বিতাড়ন (পুশ ব্যাক) করা চলবে না। সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করবে এবং সংবিধান সংশোধনেও বাধ্য করবে। উল্লেখ্য, সমাবেশে সঙঘ প্রধান 'বড়মা' বীণাপাণি দেবী (৯২)-ও উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না, ছিলেন ৪/৫ জন নেতা-মন্ত্রী। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাঁরা কোনও বক্তব্য না রেখেই সমাবেশ স্থল ত্যাগ করেন। মমতার অনুপস্থিতির কারণ, তিনি ওই সময় কলকাতা মাদ্রাসা কলেজের আন্দোলনরত ছাত্রদের ফলের রস পান করিয়ে অনশন ভাঙাতে ছিলেন ব্যস্ত। বাংলাদেশি শরণার্থী (তৃণমূলের দৃষ্টিতে অনুপ্রবেশকারী)-রা নিপাত যাক, কিন্তু মুসলিম ভোটে দাঁও মারার সুবর্ণ সুযোগে তিনি হাতছাড়া করতে চাননি। তিনি মুসলিমদের দেখাতে চেয়েছেন, অনুপ্রবেশকারীদের চেয়ে মুসলিমরা তাঁর কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও আপনজন। দেখা গেল ধর্মতলার সমাবেশে তিনি 'বড়মা'র সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎটুকুরও প্রয়োজন অনুভব করলেন না। তিনি মৌলবাদী মাদ্রাসা ছাত্রদের অনশন ভাঙানোটাকেই গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিলেন। আর এই ঘটনা থেকে কী এটাই প্রমাণিত হয় না যে সঙেঘর দাবির সঙ্গে মমতা একমত নন? তিনি রাজনৈতিক লাভক্ষতির অঙ্ক কষে পা ফেলেন। তিনি জানেন, সঙেঘর দাবি মেনে নিলে মিঞাভাইয়েরা রাগ করবে। কারণ তারা চায় না, শরণার্থীরা নাগরিকত্ব পাকা। বরং অনুপ্রবেশকারী হিসেবে তারা এদেশ থেকে বিতাড়িত হোক—এটাই তাদের কাম্য। তাছাড়া শরণার্থী (অনুপ্রবেশকারী হিন্দু)-রা এদেশে থেকে গেলে এদেশে বা রাজ্যে মুসলিমরা শীঘ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারবে না বলে তারা মনে করে। তবে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে সম্প্রতি এ রাজ্যের জেলা শাসকদের কাছে সার্কুলার এসেছে যাতে নির্দেশ আছে—জেলা শাসকরা টাস্ক ফোর্স গঠন করে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করবে এবং জেলায় জেলায় বন্দিশালা বানাবে। অনুপ্রবেশকারীদের ধরে, প্রয়োজনে তাদের তাড়া করে ধরতে হবে এবং বন্দিশালায় রাখতে হবে। পরে সময়-সুযোগ মতো বাংলাদেশে পুশব্যাক করতে হবে। একটা গণতান্ত্রিক দেশের সরকার কী করে এমন অমানবিক নির্দেশ দিতে পারে? এই নির্দেশের সঙ্গে হিটলারের ইহুদিদের ধরে ধরে বন্দিশালায় পাঠানোর নির্দেশের মিল রয়েছে। তাছাড়া সরকারের এহেন আচরণ বা নির্দেশ মানবাধিকার কমিশন ও জেনেভা কনভেনশনেরও পরিপন্থী। জেনেভা কনভেনশনে বলা হয়েছে—কোন দেশের কোন নাগরিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে তিনি অন্য কোনও দেশে আশ্রয় নিতে পারেন। বাংলাদেশে হিন্দুরা প্রতিনিয়ত ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছে। সেদেশে তাদের কোনও নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নেই। তারা বঞ্চি ত, শোষিত, নির্যাতিত ও ঘৃণিত। কাজেই নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তারা যদি এদেশে এসে আশ্রয় নেয় তবে কী তা খুব অন্যায় হবে? যেখানে বাংলাদেশ ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি মানছে না, হিন্দুদের করছে বাস্তুচ্যুত, আইন ও প্রশাসনও হিন্দুদের পক্ষে নয়, সেদেশে হিন্দুরা বাস করবে কোন্ আশা বা ভরসায়? বাংলাদেশের হিন্দুরা কতবার হবে দেশভাগের বলি? তাই বাংলাদেশি হিন্দুদের এদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার হক আছে। তাদের বিতাড়ন হবে অমানবিক। মনে রাখতে হবে, অসংখ্য বহিরাগত এদেশে এসেছে, থেকেও গেছে।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

জীবনের মূল্য

সত্যিই সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও মূল্য নেই। দীপক আর কোনওদিন ফিরে পাবে না তার বাবাকে। সংবাদে প্রকাশ গত ১৯ ডিসেম্বর রাজধানী দিল্লির রাজঘাটে এ-গ্রেড ভি. আই. পি. প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ে অ্যাম্বুল্যান্স আটকে মৃত্যু হয়েছে এক রোগীর। বছর ছেচল্লিশের অনিল জৈনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই সম্পূর্ণ বিনা চিকিৎসায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত অবস্থায় ছটপট করতে করতে মারা যান। মুমূর্ষু রোগীর পুত্র পুলিশের কাছে করজোড়ে কাকুতি-মিনতি করার পরও রেহাই মেলেনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছেন—সময়মতো নিয়ে এলে বাঁচানো যেত।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো—জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী অথবা ভি. আই. পি-দের কনভয়ে আটকে গিয়ে কারুর মৃত্যু হলে তার দায় কে নেবে? ভি আই পি-দের সময়ের মূল্য অনেক। কিন্তু একজন অসুস্থ রোগীর জীবনের কি কোনও মূল্য নেই? প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে যারা নির্বাচিত করে জনপ্রতিনিধিদের। নিরাপত্তার প্রয়োজনে যান নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অ্যাম্বুল্যান্স অথবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জনপরিষেবামূলক গাড়িকে ছেড়ে দেওয়া হয় না কেন? বাবাকে হারানো সন্তান কোনওদিন কি ক্ষমা করতে পারবে প্রধানমন্ত্রীকে?

যদু, মধুরা এভাবেই মরতে থাকবে চিরকাল। নিজের কনভয়ে আটকে রোগীর তথা সাধারণ দেশবাসীর মৃত্যুর খবর জেনেও প্রধানমন্ত্রীর মতো ব্যক্তি সাধারণ সৌজন্য দেখিয়ে দুঃখ প্রকাশ ও মৃতের নিকট আত্মীয়দের সমবেদনা জানানোকে কর্তব্য বলে মনে করবে না।

এমনি আজব দেশ। আমরাও আজব পাবলিক যারা এমন মানবিকতা(?) সম্পন্ন প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানাই, শ্রদ্ধা করি, তথাকথিত ভি আই পি-দের জনসভায় হাততালি দিয়ে ভরিয়ে দিই। মিডিয়াগুলিও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব যেন জীবনের কোনও মূল্য নেই। মূল্যহীন দীপকের চোখের জল...।

—সমীর কুমার পড়্যা, পাঁউশী, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।

ছাত্রমৃত্যু নিয়ে রাজনীতি

বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে সি পি এম যেন তত দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি আন্দুল কলেজে ছাত্র স্বপন কোলের মৃত্যুকে ঘিরে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীসহ সিপিএম নেতৃত্বের ভূমিকায় সে কথাই প্রমাণিত হয়। একজন ছাত্রের মরদেহে মালা দেওয়া, নানা বিবৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা লোটা এ রাজ্যে নজিরবিহীন ঘটনা। এ ঘটনা কৌশল সর্বস্ব রাজনীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যখন হার্মাদবাহিনীর সন্ত্রাসে আবালবৃদ্ধ বণিতা নৃশংসভাবে অত্যাচারিত হন, তাদের ঘরবাড়ি ধবংসস্তূপে পরিণত হয় তখন এ সকল সর্বহারার নেতারা নীরব থাকেন কেন? সে স্থানে উপস্থিত হওয়া তো দূরের কথা উল্টে রাজনীতির চাপানউতোর শুরু করে দেন। তাই দিকে দিকে বাম অপশাসনে মানুষের খুন, জখমের ঘটনা ঘটলেও শুধুমাত্র একজন ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বাম নেতৃত্বের এতটা বিচলিত হওয়া অবশ্যই দুরভিসন্ধিমূলক আচরণ ছাড়া কিছু নয়।

আসলে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে যে কোনও ইস্যুকে হাতিয়ার করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে সিপিএম নেতৃত্ব। এখন দলের অধিকাংশ মিটিং মিছিলে লোক সমাগম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ায় আরও চিন্তিত সিপিএম তথা বাম নেতৃত্ব। তাই তাদের নয়া কৌশল হলো বিভিন্ন পঞ্চ ায়েত বা পৌরসভা এলাকায় বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা। যাতে বেশি সংখ্যক মানুষের সান্নিধ্যে আসা যায়। কিন্তু খেলা ও মেলার মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেওয়া যায়, ভোট বৈতরণী পার হওয়া যায় না। তাই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্কুল, কলেজ নির্বাচনকে ঘিরে যে ধরনের হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির খেলায় মেতেছে সিপিএম তাতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও তা বজায় থাকবে। এমনিতেই এলাকা দখলের নামে হার্মাদবাহিনীর লাগামছাড়া অত্যাচারে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। পায়ের মাটি সরে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা আরও সন্ত্রাসের রাজনীতি কায়েম করবে তা বলা যায়। তাই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবেই ছাত্রমৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনীতির খেলা খেলতে পিছপা হলো না সিপিএম নেতৃত্ব।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

জ ন ম ত

ভোটের পাঁচালি

ধরণীধর মণ্ডল

বিধানসভার নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তরজার আসর মাত করে যেসব কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করছেন তাতে নির্দ্বিধায় বলা যায় তাঁরা ভদ্রসন্তান নহেন। পাড়াগ্রামে অশিক্ষিত বিবদমান মূর্খ-জন-ব্যবহৃত ভাষাও মনে হয় অপেক্ষাকৃত মার্জিত। আমজনতা দলতন্ত্রানুসারী। তারা দলকে ভোট দেয়, ব্যক্তিকে নয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যেন ঈশ্বরের দূত, সচ্চরিত্র, সর্বোত্তম, সর্বমঙ্গলকারক ও একমাত্র ত্রাতা, অন্যরা শয়তান! তাঁদের বাকচাতুর্যে, ললিতবাণীতে, আশ্বাসবাক্যে, প্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকারে নির্বাচক মণ্ডলী দিশেহারা হয়ে কোন্ দলকে ভোটদানে উদ্ধার করবে সেটাও শেষ মুহূর্তে নির্ধারণে অক্ষম। বর্তমানে দুর্নীতি ও রাজনীতি সমার্থক। সব দলই নিজেকে ধোয়া তুলসী পাতা বলে জাহির করতে তৎপর। দেশের তথাকথিত 'মানুষ' কাকে সমর্থন করবে? গত লোকসভা, পৌরসভা বা জেলা পরিষদ নির্বাচনে কোনও কোনও দল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়ায় এবার যে ভাবে প্রতিটি দলই সশস্ত্র আস্ফালনে মত্ত এবং দলাদলি হানাহানি ও সংঘর্ষে লিপ্ত তাতে মনে হয় ভোটের সময় পশ্চি মবঙ্গের শান্তিশৃঙ্খলার চরম অবনতির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ভোটারদের একটা বৃহদংশ ভোটদানে অনীহা মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে।

সহস্রাধিক বৎসর ভারতীয় হিন্দুদের উপর বিধর্মীদের শত অত্যাচার, উৎপীড়ন সত্ত্বেও হিন্দুরা নিজস্ব সত্ত্বা রক্ষা করতে সমর্থ ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দী থেকে হিন্দুর হিন্দুত্ব ক্রমশঃ ক্ষয়িযুঃতার পথে। স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ দিব্যদৃষ্টিতে হিন্দুর এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা অনুধাবন করে হিন্দু জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন। অভূতপূর্ব সাড়াও মিলেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় হিন্দুত্ব বিরোধী শক্তিগুলো সবিশেষ তৎপর হয়ে উঠল। বিশেষ ভাবে পশ্চি মবঙ্গে বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে— হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক নেই, হিন্দু ভোটার নেই অর্থাৎ হিন্দু নেই। এখানে মুসলিম ভোটার, মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক, মুসলিম জেহাদী সংগঠন বর্তমানে দেশের বিধাতা।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমর্থন লাভের আশায় প্রত্যেক দলই মুসলিমদের আর্থিক, সামাজিক, ধার্মিক দায়বদ্ধতা স্কন্ধে নিয়ে প্রতিযোগিতার মঞ্চে । একদল 'আলিগড়' নিয়ে এলেন 'মুসলিমাবাদে', তো অন্যদল কলকাতায় স্থাপন করলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, গগনচুম্বী হজভবন। অন্য দলের মুখপাত্র তো অনশনরত মাদ্রাসা ছাত্রদের লেবুর শরবত খাইয়ে রোজা ভাঙ্গালেন এই আশ্বাস দিয়ে যে, ক্ষমতায় এলে হিন্দুস্থানের সর্বোচ্চমানের দেওবন্দ মাদ্রাসার 'সার্কিট বেঞ্চ' চালু করবেন দেওগঙ্গার বিতাড়িত, লুণ্ঠিত, দখলীকৃত হিন্দুদের জমিতে।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ধর্মনিরপেক্ষতার অভিনয়ে কীদৃশ দক্ষ তা' গত লোকসভা, পৌরসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জনসাধারণের অজানা নেই। হিন্দুরা মাথায় গোল টুপি, ঘোমটা মাথায় মোনা জাতের ভঙ্গী করে অভিনয়, অবিবাহিতা মুসলিম মহিলা ঁমাকালীর চরণাশ্রিত সিঁন্দুর ও চরণামৃত পানের অভিনয় (যা ভোটের স্বার্থে 'পুতুল' মাকালীর আশীর্বাদ প্রার্থনা — জায়েজ), দরগার সমাধিতে কাফেরের আচ্ছাদন বস্ত্র দান ও মোমবাতি জ্বালিয়ে পীরসাহেবের দোয়া প্রার্থনা— ইত্যাদি ইত্যাদি। অপর এক ধর্মশঙ্কর নেতা তো হিন্দুত্ববাদকে লস্কর-এ তৈবার সমগোত্রীয় আখ্যা দিলেন। অদূর ভবিষ্যতে সর্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী পরিবারটির দৌলতে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চালু করতে পারলেই ধর্মনিরপেক্ষতার ষোলকলা পূর্ণ হয়। ভোট হয়ত সংগ্রহ করা যায় কিন্তু চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না।

রাজনৈতিক দরদ যখন ক্ষমতার দম্ভে পরিণত হয় তখন সে দলের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। গত শতাব্দীর সাতের দশকের সিপিএম-এর উত্থান এবং একবিংশ শতাব্দীর ১ম দশকে অধঃপতন এর জ্বলন্ত উদাহরণ। মমতাদেবীর সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের মমতাভরা আচরণ এত অল্প সময়ের মধ্যেই যে ভাবে দম্ভের শীর্ষে আরোহণ করেছে তার পরিণতি কি সাবলীল হবে?

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চি মবঙ্গে দৃশ্যতঃ মুসলিম ভোট তিন ভাগে বিভক্ত হবে ও হিন্দু ভোট বহুধা বিভক্ত। গাণিতিক নিয়মে হিন্দু ভোটের মূল্য কম বা নগণ্য। সব দলই তো দুর্নীতিপরায়ণ। 'সাম্প্রদায়িক' হিন্দুদের ভোট কোন্ দিকে যাবে? যে দল তুলনামূলক ভাবে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ, নীতিবাগীশ ও হিন্দুত্ব মেনে চলার চেষ্টা করে সেই দলকেই সমর্থন জানানো একান্ত সময়োপযোগী ব্যবস্থা হিসেবে অবলম্বন করা উচিত।

আসলে হিন্দুরা ভীরু, সংগঠনহীন, সারমেয় স্বভাবজাত আত্মকলহে লিপ্ত এবং মুসলমানদের ভয় করে। মুসলিম আক্রমণের প্রতিরোধ করার কোনও চেষ্টাই করে না। নইলে দেগঙ্গায় এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটল, বিরাট আকারের একতরফা হামলা ও লুটতরাজ সব নির্বিবাদে হজম করে নিল! অগ্নিদাহ, মন্দির, প্রতিমা ধবংস, এমনকি নারী নিগ্রহ পর্যন্ত হলো কিন্তু কৈ একটাও তো হিন্দু মরল না! কারণ মহাবাক্য 'য পলায়তি স জীবতি', 'ত্যাক্তেন ভুঞ্জিথাঃ', "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং" পালন করল হিন্দুরা। দেগঙ্গায় পরে হিন্দুরা দুর্গাপূজা বয়কট করল। আর সারা পশ্চি মবঙ্গে হাজার হাজার দুর্গাপুজো হৈহুল্লোড়, আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাখ লাখ টাকার শ্রাদ্ধ করল। কিন্তু কোনও পূজা কমিটি দেগঙ্গার প্রতি সমব্যাথী হয়ে সামান্যতম সহানুভূতিও প্রকাশ করল না। এতই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব! ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে অর্বাচীন তৃণমূল খুবই বড়াই করে। সেই দলই দলীয় সাংসদকে লেলিয়ে দিয়ে উদ্বাস্তু হিন্দুদের রামরাজ্য হিন্দুস্থানের স্বপ্নরাজ্য থেকে পুনরায় উদ্বাস্তু, সর্বহারা হতে হলো। নেতারা 'গরু মেরে জুতা দান' করে হিন্দুদের সাথে শান্তি মিছিল করেই দায়িত্ব চুকাল। হিন্দুরা এবার কোথায় যাবে? আর একটা অতীব আশ্চর্যের বিষয়— বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা বিজেপি কোনও বৃহত্তর আন্দোলন বা প্রতিবাদ করার কথা একটুখানি চিন্তাও করল না! শাক্তভক্তরা একটু শক্ত হ'য়ে শক্তিময়ীকে রক্ষার্থে যদি শক্তিশেলের শক্তি পরীক্ষা করতে উদ্যত হোত তবে 'পরিবর্তনের' ধারার পরিবর্তন হয়তো হতে পারত।

সাধু সাবধান...এখনও সময় আছে,— হিন্দু মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত বর্গের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, গ্রামাঞ্চ লে তাঁদের পদধূলি দান করতে। একটু প্রচার কার্য চালালে হয়তো হিন্দুদের মান, সম্মান, সম্ভ্রম, অধিকার, দাবী রক্ষিত হবার সুযোগ আসতে পারে।

পরম্পরা

পয়লা মাঘ কি বিতর্কিত ?

সমীর চ্যাটার্জী

পয়লা মাঘ দিবসটি সনাতন ভারতীয় সমাজে শুধু গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন নয়, এই দিনটি বিবিধ বৈশিষ্ট্যে প্রাঞ্জল। জ্যোতিষ গণনা মতে সূর্যের অয়ন শুরু হচ্ছে এই পরম দিনটিতে। সূর্য কেন্দ্রিক পৃথিবীর ঘূর্ণাবর্তে সূর্য দক্ষিণ হতে উত্তরের পথে প্রসার হলেন। উত্তরাভিমুখী অয়নে প্রথম সূর্য সম্পাতের শুভারম্ভকে কল্পনা করে ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতিতে বিবিধ কল্যাণ ব্রতের উদযাপন। রসাতল হতে দেবলোকের যজ্ঞমূলে সূর্যের প্রত্যাবর্তন দিবসটি সাধারণভাবে উত্তরায়ণ নামে কথিত।

এই পরম দিনটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্বাচিত করেছিলেন গার্হস্থ্য ধর্ম হ'তে উত্তরণের শুভ পুণ্যাহ রূপে। সন্ন্যাসে দীক্ষা তাঁর এই শুভ পুণ্যাহে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবত একটা প্রশ্ন জাগে ভগবানের আবার সন্ন্যাস কেন? তিনি তো বর্ণাশ্রমের অতীত এক পরমপুরুষ রূপে পূত সলিলা জাহ্নবীর উপকূলে অবতীর্ণ। ঈশ্বর নরদেহ ও রূপ দেহ ধারণ করে যখন ধরাধামে আসেন, তখন সকল লৌকিক ক্ষেত্র ও বিষয়গুলিকে মান্যতা দান করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে যাবতীয় লৌকিক ও কুলাচারে মান্যতা দান করেছেন। শিক্ষা গ্রহণ, উপনয়ন, বিবাহ, পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ কর্মাদি সকল অনুষ্ঠানই নিষ্ঠা সহকারে পালন করেছেন। তাঁর অবর্তমানে জায়া ও জননীর যাতে কোনও অস্বাচ্ছন্দ্য না ঘটে তাহার সুব্যবস্থাও করেছেন। যে কর্ম করার জন্য তাঁর এই ধরাধামে আগমন সেই অভীষ্টলাভের পথে অগ্রসর হওয়া অপরিহার্য ছিল। লোক শিক্ষার নিমিত্ত তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গৌতম বুদ্ধ আর্য প্রবর্তিত যজ্ঞকাণ্ডের প্রতিবাদী ছিলেন। সমাজ কল্যাণের জন্য প্রেম ও সেবার পথ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁকেও সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়েছিল। সমগ্র ভারত তাঁর অনুগামী হয়েছিল। পরবর্তীকালে জ্ঞান কর্মকাণ্ডের প্রচারক শঙ্করাচার্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অদ্বৈতবাদ সমগ্র ভারতে সংহতি রক্ষায় সমর্থ হয়েছিল। বুদ্ধের ও শঙ্করাচার্যের কল্যাণ কর্মের মধ্যে যেটুকু ত্রুটি ছিল, সেই ত্রুটি সংস্কার করে ভারতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রেম ধর্মের প্রচারের দায়িত্ব পালন করে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করতে অবতীর্ণ তিনি। সুতরাং ত্যাগ বৈরাগ্যের পথেই তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থিত হ'তে হবে, তাই তাঁর সন্ন্যাস অপরিহার্য।

ভগবান বারবার এই সন্ন্যাসের পথ বেয়ে ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছেন। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভারত পরিক্রমা করেছেন পদব্রজে। অতি আধুনিককালে স্বামী বিবেকানন্দ পদপরিক্রমায় ভারতের অন্তর আত্মাকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাজা অথবা রাজনীতিবিদরা কোনওদিন তাঁদের অস্ত্রবলে কিংবা কূটনৈতিক কৌশলে ভারতের পতন রোধ করতে সমর্থ হয়নি। যে কাজ ঈশ্বর প্রতিম সন্ন্যাসীরা সম্পাদন করেছেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। সেই ইষ্ট পূরণে তিনি পয়লা মাঘ সূর্যের উত্তরমুখী অভিসারের প্রথম পুণ্যাহকে নির্বাচিত করে কাটোয়ায় (কণ্টকনগরে) জাহ্নবী উপকূলে

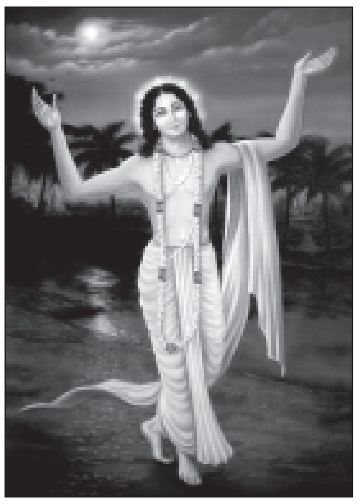

সমুপস্থিত।

সন্ন্যাসী কেশব ভারতী। তাঁর সামনে এক অনিন্দ্য সুন্দর যুবা পুরুষ। যাঁর সর্বাঙ্গে দৈবী বর্ণালোকের ছটা, অন্তর ঐশী সত্ত্বায় বিকশিত। যে যুবকের কোনও পার্থিব আকাঙ্ক্ষা নয়, এমনকী অপার্থিব মুমূক্ষু ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়নি, শুধু কামনা করছে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ। কামনা করছে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দীক্ষা। স্তম্ভিত কেশব ভারতী। কে এই অনিন্দ্যসুন্দর? কার তনয়, কি পরিচয়? সংশয় মনে, সন্ন্যাসী তিনি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। নরমাংস দেহী ঈশ্বর যাঁর ঈষ্ট, সেই ঈশ্বর তাঁর সম্মুখে সমুপস্থিত? ঈশ্বর দীক্ষা ভিক্ষা করছে তাঁর মতো একজন সন্ন্যাসীর কাছে? পরমেশ্বরের একি লীলা? নিজের সত্ত্বাটিকেও তিনি একবার যাচাই করে নিচ্ছেন— সন্ন্যাসী সার্থক তোমার সন্ন্যাস! বারেন্দ্র প্রবর কালীনাথ আচার্য, জন্ম তোমার সার্থক। যৌবনেই ঈশ্বরকে ইষ্ট জ্ঞানে যিনি পরম মোক্ষের পথে অনুসন্ধানী হয়ে কালীনাথ আচার্যের আবরণ হতে কেশব ভারতীতে প্রকটিত, সেই তাঁর মৌল ব্যক্তি সত্তায় আজ এক পরমানন্দের অনুভূতি অনুরণিত হতে লাগলো। কেশব ভারতী বললেন—'দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব ভারতী/আনন্দ সাগরে পূর্ণ হই করে স্তুতি।। যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে/এ ভক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে।। তুমি যে জগৎ গুরু জানিল নিশ্চয়/তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু কয়।। তবু তুমি লোক শিক্ষা নিমিত্ত কারণে/ করিবা আমারে গুরু, হেন লয় মনে।।' (শ্রীচৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস)

কাটোয়ার জাহ্নবীকূলে দীক্ষার আয়োজন হলো। জাহ্নবীকূলে তখন আকুল জনতার ভিড়। 'নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে/ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে।। ক্ষুর দিতে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে/হাত নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে।।

আয়োজন সম্পূর্ণ হলো। জাহ্নবীতে স্নান সম্পূর্ণ করলেন। গঙ্গার ঘাটে ভক্তরাও এসে উপস্থিত হয়েছেন। দীক্ষা গ্রহণের সকল ব্যবস্থা করেছেন চন্দ্রশেখর আচার্য। দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, তাম্বুল, চন্দন, পুষ্প, যজ্ঞসূত্র এমন কী কিছু আহারাদির সামগ্রী। হরি নামে মত্ত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, তাঁর সঙ্গে মুকুন্দ গাইছে! বিরজা হোম ও শ্রার্দ্ধ্য কার্যাদি সুসম্পন্ন হলো, কি মন্ত্রে দীক্ষা হবে তাও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কেশব ভারতীর কানে কানে বললেন যে এই মন্ত্র তিনি স্বপ্নে পেয়েছেন। 'প্রভু বলে "স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন/কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিলা কথন।। বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে" এত বলি প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে।। ছলে প্রভু কৃপা করি তাঁরে শিষ্য কৈল/ভারতীর চিত্তে মহা বিস্ময় জন্মিল।। (শ্রীচৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবন দাস) সন্ন্যাস পর্ব তো সম্পাদিত হলো। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দীক্ষান্তে নাম প্রদান নিয়ে সমস্যায় পড়লেন কেশব ভারতী। ভারতীয় শিষ্য সন্ন্যাস সমাজের প্রচলিত বিধি অনুসারে শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভারতী নাম যুক্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হলো না। কেশব ভারতী বললেন, 'যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া/করাইলা চৈতন্য-কীর্ত্তন প্রকাশিয়া।। এতেক তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য/সর্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য।। নবদ্বীপ নদীয়া জন্ম দিয়েছিল একটি দেবশিশুর। কাটোয়া সেই দেব শিশুকে পরিণত করলো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যতে।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দিনটিকে কেন্দ্র করে কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে। মহাজনেরা বিভিন্ন মত এই সম্পর্কে পোষণ করেছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস বলেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভিপ্রায়— 'শুন শুন নিত্যানন্দ স্বরূপ গোসাঞি/ একথা ভাঙ্গিবে যবে ঠাঞি।। এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে/নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।। শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর অন্তরঙ্গদের কবে সন্ন্যাস করবেন তাহা অতি সঙ্গোপনে বলেছেন, সেই ভাষ্যের সূত্রে বলা যায়, উত্তরায়ণের দিন অর্থাৎ পয়লা মাঘ তিনি সন্ন্যাস করেছিলেন। মকর সংক্রান্তির পরের দিনই প্রভুর সন্ন্যাস একথা অনেকে মনে করেন। কিন্তু মুরারী গুপ্তের কড়চায়— 'ততঃ শুভে সংক্রমণে রবে ক্ষণে। কুম্ভং প্রযাতি মকরান্মানাষী। সন্ন্যাসং মন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্ম শ্রী কেশবাখ্যো হরয়ে বিধান বিৎ'।। (১০/৩ প্রক্রম/ছয় স্বর্গ)। অর্থাৎ মাঘ মাসের শুভ সংক্রান্তি দিবসে রবির মকর হতে কুম্ভরাশিতে সংক্রমণ কালে বিধান বিৎ স্ত্রীল কেশবাসী মনীষী শ্রীহরিকে সন্ন্যাস মন্ত্র দান করলেন। লোচনদাসের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে— মকর নেউটে কুম্ভ যাইসে হেনকালে/ সন্ন্যাসের মন্ত্রগুরু কহে হেনকালে।। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বলেছেন 'চবিবশ বছর শেষে, সেই মাঘ মাস/তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।। ওঁদের ভাষা সূত্রে পয়লা মাঘ দিনটি সন্ন্যাস গ্রহণের দিন বলে ধার্য্য করা যায় না। মাঘের সংক্রান্তিতে অর্থাৎ ২৯শে মাঘ প্রভু সন্ন্যাস করেছেন। প্রচলিত মতে প্রভু পূর্ণিমা তিথিতে সন্ন্যাস করেছেন। তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন পূর্ণিমাতে, (দোল পূর্ণিমায়) তাঁর দীক্ষান্ত নব জন্ম ওই পূর্ণিমা তিথিতে।

...এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে/ নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাস।। এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করলে প্রভুর সন্ন্যাসের তারিখ পয়লা মাঘই হয়। কিন্তু বহু মহাজনের সিদ্ধান্ত পয়লা মাঘের প্রতিবাদী। তাঁদের মতে ২৯শে মাঘ শনিবারে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। শনিবারে ঊষার স্নিগ্ধ অরুণালোকে সন্ন্যাস গ্রহণ কার্য সম্পাদিত হয়। ২৮ মাঘ শুক্রবার সেদিন পূর্ণিমা। তিনি ২৭ মাঘ বৃহস্পতিবার গৃহত্যাগ করে শুক্রবার প্রভাতে কাটোয়া পৌঁছান। অপরাহ্ন যথাবিহিত শাস্ত্র কর্মাদির পর পরদিন ভোরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

ষোড়শ মহাজনপদ অঙ্গ

গোপাল চক্রবর্তী

ষোড়শ মহাজনপদের এক অন্যতম মহাজনপদ অঙ্গ ছিল বিহারের ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা নিয়ে গঠিত অর্থাৎ বিহার প্রদেশের পূর্বভাগ। অথর্ববেদে অঙ্গবাসীদের ব্রাত্যজাতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের বসতি ছিল শোন ও গঙ্গার অববাহিকায়। পাণিনিও অঙ্গদেশকে বঙ্গ কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রের সঙ্গে মধ্যদেশের অন্তর্ভূক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে বলিরাজের মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভজাত ঋষি দীর্ঘতমসের বংশধরগণ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে বাস করতেন। আধুনিক নৃতাত্ত্বিকগণও অনুমান করেন যে অঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য রয়েছে।

অঙ্গরাজ্যের নামকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। মহাভারতের আদিপর্বে আছে যে রাজা অঙ্গের নামানুসারেই রাজ্যের নামকরণ হয়েছে। আবার রামায়ণে আছে কামদেব বা মদন শিবের তপস্যা ভঙ্গ করায় শিবের রোষানলে এখানেই অঙ্গ পরিত্যাগ করে অনঙ্গ হন বলে দেশের এই নাম।

রামায়ণ ও মহাভারতে অঙ্গরাজ্যের

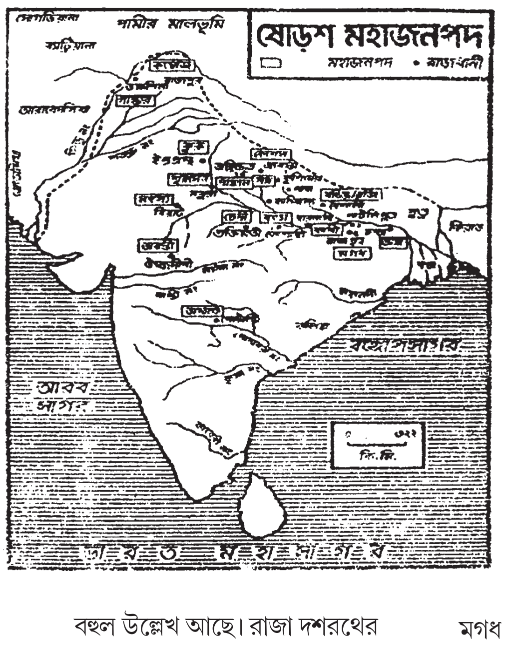

বহুল উল্লেখ আছে। রাজা দশরথের অন্তরঙ্গ মিত্র অঙ্গরাজ রোমপাদ বা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ও নিজ কন্যা শান্তার সঙ্গে মুনির বিবাহ দেন। সুতপুত্ররূপে পরিচিত কর্ণকে দুর্যোধন অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, রাজার মর্যাদা দিয়ে আপন শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন।

চম্পা ও গঙ্গা এই দুই নদী অঙ্গ রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা বা মালিনী। এখনও ভাগলপুরের কাছে এর অস্তিত্ব আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে ভারতের অন্যতম ছয় প্রধান নগরের অন্যতম বলে একে নির্দেশ করা হয়েছে। গৌতমবুদ্ধ এবং মহাবীরের জীবনের একাধিক ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই চম্পা পবিত্র তীর্থস্থান। প্রাচীন ভারতের শিল্প সমৃদ্ধ নগরীর অন্যতম চম্পা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র রূপেও প্রখ্যাত হয়। চম্পা থেকে গঙ্গার পথে অঙ্গের বণিকেরা বাণিজ্য তরী নিয়ে সমুদ্রে চলে আসত এবং মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ তথা সমগ্র দূর প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। দূর প্রাচ্যের কোথাও কোথাও আবার তারা উপনিবেশও স্থাপন করেছিল। মগধের সঙ্গে অঙ্গের ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা। এর ফলে মগধ এই রাজ্যকে গ্রাস করে। গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগের সময় দেখা যায় অঙ্গ রাজ্য মগধের অন্তর্ভূক্ত এবং বিম্বিসার অঙ্গ-মগধের রাজা। যুবরাজ অজাতশত্রু অঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন।

অথ বিবাহ কথা!

বিদিশা ভট্টাচার্য

ত্মমাঘ মাস থেকেই প্রজাপতি পক্ষ চলে। ফাল্গুন তো মধু মাস, তাই বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে এই প্রতিবেদন।ব

যদিদং হৃদয়ং মম।
তদিদং হৃদয়ং তব।।

এই মন্ত্রটির সঙ্গে বেশিরভাগ মানুষই পরিচিত। ঠিক এরকমই একটি দিনের নিমন্ত্রিত ব্যক্তি হয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ আমি পেলাম কিছুদিন আগে 'প্রণয়-সমাপ্তির' শুভ পরিণয়ে। সত্যিই খুব ভাল দুটি নাম, তাই না! দু'জনের মেলবন্ধনে 'প্রণয়ে'র দ্বারা জীবনের কালিমার 'সমাপ্তি' ঘটবে। 'বিয়ে'-এর আক্ষরিক অর্থ হলো বিশেষভাবে বহন করা। আবার অন্যদিকে বিয়ে মানে সিঁথির সিঁদুর, শাখা-নোয়া-পলা, বিয়ে মানে করগ্রহণ, নতুন পথে চলা। মনে পড়ে যায় 'ব্যবধান' ছবিটির সেই সুপরিচিত গানটি— "কত না ভাগ্যে আমার, এ জীবন পুণ্য হলো। সিঁথির এই একটু সিঁদুরে সবকিছু বদলে গেল।"

সত্যিই কী বদলে যায়? জানি না, হয়তো যায়। একটি নবদম্পতির জীবনে জড়িয়ে থাকে ভালবাসা, কত নিয়ম-রীতি পালন বা

অঙ্গনা

রাগ-অনুরাগের ছোঁয়া। যে ছোঁয়ার স্পর্শে দুটি রঙিন মনের মিলন ঘটে, তাঁদের চোখে থাকে শান্তির নীড় গড়ার স্বপ্ন। যেখানে বাসা বাঁধবে সুখের অনুভূতি এবং তাদের মধ্যে থাকবে একটুখানি চাওয়া আর অনেকখানি পাওয়া।

দু'জন দু'জনের পথ চলার চিরন্তন সাথী। তাদের মধ্যে থাকে দায়বদ্ধতা। থাকে পারিবারিক গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার সংকল্প। তারা খুঁজে নেয় রূপের মাঝে অরূপকে যা কখনওই হারানোর নয়। যা চিরসবুজ ও চিরনবীন। এই রূপ বোধহয় এমনই অধরা যা তখনই স্বীকৃতি পায় যখন ভালবাসার মানুষটার কাছ থেকে সেই অঙ্গীকার স্বরূপ বাক্যটি শোনা যায়—

"ও রূপের মিথ্যে গরব
অমন যদি বিরূপ থাকে
ও গুণের কী দাম বলো
লাজে যদি আগুন লাগে"।

এই ভাললাগা আর ভালবাসার মধ্যে মিশে থাকে বিশ্বাস। যা খুবই মর্মস্পর্শী। যে বিশ্বাসের জোরে একটি মেয়ে তার শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত যাদের কাছে থেকেছে, জীবনের সব বলে ভেবে এসেছে, তাদেরকে ছেড়ে আরেকজনের হাত ধরে অন্য নীড়ে চলে যায়, তখন তার হাতটি শক্ত ক'রে ধরে

থেকে আগামী পথে চলা শুরু হয়। আর পাশের মানুষটি তার হাতকে শক্ত করে ধরে রেখে জানান দেয় "আমি আছি তো তোমার সাথে, ভয় কী?"

এও কী সম্ভব! যাদের ভালবাসায় বড় হওয়া, যাদের হাত ধরে পথ চলা, যাদের শাসনে নিজের ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার সুযোগ। সেই বাঁধনগুলো ছিন্ন করে নতুন পরিবারে গিয়ে সুখ রচনা করার দায়িত্ব থাকে তার উপর। যা ঘটায় দুটো পরিবারের মধ্যে এমনই এক আত্মীয়তার সম্পর্ক যা নিগূঢ়। কিন্তু যে ভালবাসার বিশ্বাসে সে অচেনা-অজানা মানুষটির হাত ধরেছে সেই মানুষটি তার চোখে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নকে সফল করবে তো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবে। কারণ সবশেষে বিয়ে মানেই তো সুখী জীবনের প্রথম প্রতিশ্রুতি।

অনেক মেয়ের চোখেই লুকিয়ে থাকে এই বিয়ে বা বিবাহ নামক এক অজানা পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য। আপনিও খুঁজে পাবেন এমন অনেক সমাপ্তিকে আপনারই সমাজে বা আপনারই চেনা কোনও পরিসরে।

সমাপ্তির মতো এমন অনেক নারীর জীবনই চলতে থাকে সুন্দরভাবে, তারা তৈরি করে রঙিন স্বপ্নের বালুচর। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে আসা এক ঢেউ সব ভেঙে দেয় তাসের ঘরের মতো। এই ঢেউ জীবনে আসে 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' রূপে, যা খুবই দুঃখজনক। দু'জন মানুষের তৈরি করা সাম্রাজ্যকে ভেঙে দেয় এই পথটি। কিন্তু প্রকৃতই কী ভাঙা যায়? ইতিহাসের পাতা যদি আমরা হাতড়াই, তাহলে দেখতে পাব যে একটি মেয়েকে নিজের অধীনে আনার জন্য শাঁখা-পলা যা শিকলের ন্যায় পরানো হোত আর সিঁথিতে কিছুর দ্বারা আঘাত করে বোঝানো হোত সে এখন কারোর অধিকৃত। অথচ একটি পুরুষের কেন তা হবে না? এটি কী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বলে? এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো বিয়ে কতটা প্রাসঙ্গিক আধুনিক নারী সমাজের কাছে?

অনেক নারীর কাছে এটি প্রাসঙ্গিক, অনেক নারীর কাছে নয়। তাই বোধহয় তারা সিঁথির সিঁদুর বা শাঁখা-পলাকে বর্জন করে। স্বাধীন জীবন-যাপনের জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের' সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু অনেক নারী তারা স্বামীর কল্যাণের জন্য সিঁথির সিঁদুরকে সম্মান জানায়। তাতে কী সেই নারীর অধিকার বেড়ে যায়? না, বাড়ে না। তাকে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় শুধু সংসারের ভাল'র জন্য। অনেকসময় সে আর পারে না। ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তবু চেষ্টা চালিয়ে যায়। কী করে একটি সংসারকে সুখে-শান্তিতে গড়ে তোলা যায় নিজের সর্বস্ব দান করে।

তাই বোধহয় আজ বর্তমান সমাজের নারীরা পিছিয়ে নেই। তারা এখন স্ব-প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। 'বিবাহ' শব্দটি তাদের কাছে এখন শুধুই প্রথাসমৃদ্ধ একটি অনুষ্ঠান। কিন্তু তাও অনেকেই 'বিবাহ-বন্ধনে' আবদ্ধ হয়। আবার 'বিবাহ-বিচ্ছেদে'ও সম্মতি দেয়। কিন্তু যারা পারে না সেই জন্ম-জন্মান্তরের আবদ্ধ প্রেমের সম্পর্ককে ভাঙতে, তারা কাঁদে, প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। তাদেরও মনে থাকে সেই ভাললাগার মানুষটির প্রতি ভালবাসা। তাকে নীরবে মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এগিয়ে যায় জীবন গড়ার কাজে। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সেই গানটির কথা বলতেই হয়—

"ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী।
কেহ জানিবে না, মোর গভীর প্রণয়
কেহ দেখিবে না, মোর অশ্রু বারিচয়"।।

এই গানগুলো সত্যিই মনকে নাড়া দেয়। তাই মনে হয় সত্যিই বিয়ে ভাল, বিচ্ছেদ ভাল নয়, কোনও সম্পর্ক গড়া ভাল কিন্তু ভাঙা নয়।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মধ্যেও ছিল অভিসার, অনুরাগ, বিচ্ছেদ। কিন্তু তাদের ভালবাসা আজও অমর।

"কেউ কী ভেবেছিল শ্যামকে
ভালবেসে রাধার ভালবাসা
কাহিনী হয়ে যাবে।।"

সত্যিই ভাবা যায় না। কিন্তু তখনই ভাবা যায় যখন ভালবাসার মানুষটার নাম কাগজে বা পাথরে লিখে নয় হৃদয়ে লিখতে হয় ভালবাসার কালি দিয়ে আর সেই বন্ধনের সামাজিক স্বীকৃতি হলো বিবাহ। যার প্রাসঙ্গিকতা বা অপ্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক আছে। তবুও আদি-অনন্তকাল ধরে যা চলে আসছে তার কী কোনও গুরুত্ব নেই? অবশ্যই আছে। তাই তো অনেক দাম্পত্য জীবন আজও সুখকর হয়। সবই বিধির বিধান কে খণ্ডাবে। তাই কথায় বলে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে।

যে মানুষটার সাথে অগ্নিদেবকে সাক্ষী করে সপ্তপদী অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ কি জরুরী? বিচ্ছেদ ভুলে গিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হোক নতুন মনের। বা নতুন প্রাণেরা। অনেক শুভেচ্ছা রইল সেইসব নতুনদের জন্য। সব কথার শেষে সেই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি যাকে আশ্রয় করে এগিয়ে যেতে হবে নতুনের পথে—

"আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই,
তুমি তাই গো—
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই,
কিছু নাই গো"।।

জগতে তাকেই সবচেয়ে আপন ভেবে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে না হয় এগিয়ে যাওয়া থাক না বাকী জীবন, ক্ষতি কী?

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ২২

সমাবেশ সমাচার

হনুমৎ শক্তি জাগরণ কার্যক্রম

উত্তর বীরভূম জেলায় হনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতির উদ্যোগে শ্রীহনুমান পূজা, মহাযজ্ঞ ও তৎসহ বিরাট হিন্দু-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই জেলার ১৩টি স্থানে এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানগুলো হলো বালিয়া (মুরারই), ভবানন্দপুর, নলহাটী, আকালীপুর, বুজুং, আয়াস, ভাটিনা, কাষ্ঠগড়া, বিষ্ণুপুর, তারাপুর, মল্লারপুর, কামড়াঘাট (ময়ূরেশ্বর) ও রামপুরহাট। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিটি স্থানেই প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল।

জেলার শেষ অনুষ্ঠানটি হয় গত ২ জানুয়ারি, রামপুরহাটে। সকাল ৮টায় চণ্ডীপাঠের

উত্তর বীরভূমের ব্রাহ্মণী খণ্ডের আয়াসে হিন্দু সম্মেলন।

পর হনুমান পূজা, হনুমান চালিশা পাঠ ও অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণকল্পে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বনবাসী সমাজের ধর্মগুরু গঙ্গারাম মুর্মু সঙ্ঘের বনবাসী ক্ষেত্র থেকে আসা প্রায় এক হাজার ছেলে-মেয়ের জন্য সাঁওতালী ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। সাধু-সন্ত ও সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

কল্যাণী

গত ২৬ ডিসেম্বর নদীয়া জেলার কল্যাণী-র আই টি আই মোড় ময়দানে শ্রীহনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতির উদ্যোগে এক মহাযজ্ঞানুষ্ঠান ও হিন্দু-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মহাযজ্ঞানুষ্ঠান ও সম্মেলনে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডঃ নিতাইচরণ দাস, বঙ্কিমচন্দ্র ধর, সমীরন সরকার, আর এস এসের নদীয়া বিভাগ প্রচারক মধুময় নাথ প্রমুখ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নদীয়া জেলা সঙ্ঘচালক ধীরেন দেবনাথ।

বিবেকানন্দ জন্মোৎসব

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

স্বামীজীর জন্মদিবসে দক্ষিণ চবিবশ পরগণার বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র-যুবদের মাধ্যমে আয়োজিত হলো একাধিক অনুষ্ঠান। ডায়মন্ডহারবারে বিবেকানন্দ ছাত্রচক্র-এর ছাত্ররা সন্ধ্যায় মশাল মিছিল করে স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা করে। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন আর এস এসের দক্ষিণ চবিবশ পরগণা বিভাগ প্রচারক শ্যামাচরণ রায়। এছাড়াও বাখরাহাটে ছাত্র-যুবদের সন্ধ্যাকালীন বিবেক জ্যোতি যাত্রা, ক্যানিং কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক কথায় সুদূর পাথরপ্রতিমার দক্ষিণ কাশিয়াবাদ থেকে শুরু করে মগরাহাট, দক্ষিণ বারাসতসহ দক্ষিণ চবিবশ পরগণার প্রতিটি প্রান্তে স্বামীজীর ১৪৯তম জন্মদিবস ধুমধাম সহকারে পালিত হয়।

মালদা

প্রতিবছরের মতো এবারও কলিগ্রাম স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো একাধিক জনসেবামূলক অনুষ্ঠান। কলিগ্রাম ভারতী ভবন রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন মোহিতলাল গোস্বামী। সকালে প্রভাতফেরী ছাড়াও রক্তদান শিবির ও চক্ষু-পরীক্ষা শিবির আয়োজিত হয়। ওই দুই শিবিরে যথাক্রমে ৪২ ও ৬৬ জন যোগদান করেন। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন আর এস এসের উত্তরবঙ্গ সহপ্রান্ত প্রমুখ জলধর মাহাতো।

ফারাক্কা ব্যারেজ

গত ১২ জানুয়ারি ফরাক্কায় স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৯ তম জন্মদিবস পালিত হলো স্থানীয় বিবেকানন্দ স্মারক সমিতির উদ্যোগে। প্রস্তাবিত ফারাক্কা ব্যারেজের নিকটবর্তী বাজারস্থিত স্বামীজীর আবক্ষমূর্তির পাদদেশে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্পের উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হরিশচন্দ্র রায়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বাঁধ প্রকল্পের মহাপ্রবন্ধক কে যাদব।

বৌদ্ধসম্মেলনে সংস্কৃত নাটক

সুইজারল্যান্ডের 'ভেবে'তে অবস্থিত, 'The International Repeten Foundation' গত ৮ ডিসেম্বর নেপালের অন্তর্গত ভগবান বুদ্ধের পবিত্র জন্মস্থান লুম্বিনীতে তাদের 'Mother Temple'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী 'আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ মহাসম্মেলন'-এর আয়োজন করেন। প্রথম দিনেই সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের অপরাহ্নে কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'সুরভারতী সংস্কৃত ইনস্টিটিউটে'র শিল্পীরা ডিরেক্টর অধ্যাপক শান্তিদেব ঘোষ নির্দেশিত ও বিরচিত 'ধর্মাশোকম্' সংস্কৃত নাটকটি মঞ্চাভিনয় করেন। আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, তাইল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, তিববতসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি বৌদ্ধ ভিক্ষু, গৃহী বৌদ্ধ রা এই মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত উৎসব

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি তাদের ২০১১ সালের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত উৎসবের আয়োজন করেছিলি কলকাতার রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে। সহযোগিতায় ছিল ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার। এই উৎসব গত ৭ থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এই উৎসবে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম মেকার্স ফোরামের ছড়ঢত্তগুং পক্ষ থেকে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

নেতাজী জন্মজয়ন্তী

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৫ তম জন্মজয়ন্তীতে গত ২৩ জানুয়ারি পদ্মপুকুর নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সকাল ৯ টায় হাওড়ার পদ্মপুকুর রেল স্টেশনের সন্নিকটে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে তাঁর জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়।

দুর্গাপুরে স্বাস্থ্য শিবির

গত ২৪ ডিসেম্বর দুর্গাপুর মহকুমার ইচ্ছাপুর গ্রামে সমাজ সেবা ভারতীর অনুমোদিত "বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদ"-এর পরিচালনায় একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রায় শতাধিক ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং রক্ত পরীক্ষা করানো হয়। বেশ কয়েকজনের রক্তে "ব্লাড সুগার" পাওয়া যায় এবং তাদের পরবর্তীকালে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়। রক্তের শ্রেণী নির্ণয়ও করানো হয় প্রায় ২৮ জনের। এই শিবিরে ভরসা ওয়েল-ফেয়ার সোসাইটির পাঠানো ৫ জন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কেশব দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ডাক্তার রাজীব ঘাঁটিও উপস্থিত ছিলেন। গ্রামের বলরাম হালদার ও কালোসোনা নাগ ডাক্তারদের স্বাগত জানান ও সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

শোকসংবাদ

পরলোকে ডাঃ মনোরঞ্জন দত্ত

গত ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মেদিনীপুর শহরে নিজ বাড়িতে দেহত্যাগ করেন সুপরিচিত রাজনৈতিক ও সমাজসেবী ব্যক্তিত্ব ডাঃ মনোরঞ্জন দত্ত। মৃত্যুকালে তাঁর

বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। মেদিনীপুর জেলায় ভারতীয় জনতা পার্টির জন্মলগ্ন থেকেই তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। কৃতী ছাত্র মনোরঞ্জনবাবু পেশাগত চিকিৎসা ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি আশির দশকে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকবার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯৯১ সালে লোকসভায় বিজেপি-র পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাহুল রঞ্জন দত্তের অকাল-প্রয়াণ ঘটে মাস দু'য়েক আগে। স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন আগেই। কনিষ্ঠপুত্র দেবল রঞ্জন দত্ত ও অন্যান্য গুণমুগ্ধদের রেখে গেলেন তিনি।

* * *

হাওড়া জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের মাতৃদেবী সত্যবালা মণ্ডল ৭৫ বছর বয়সে গত ৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় পরলোক গমন করেন। তিনি ছয় পুত্র, এক কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ কলকাতার সূর্য সেন নগরের স্বয়ংসেবক শচীন্দ্র কুমার নন্দী ৮৬ বছর বয়সে গত ১৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় পরলোক গমন করেন। তাঁর পুত্র স্বপন নন্দীও স্বয়ংসেবক। মৃত্যুকালে তিন পুত্র, তিন কন্যা, এক নাতি ও দুই নাতনিকে রেখে গেছেন।

* * *

সূর্য সেন নগরের স্বয়ংসেবক সুপ্রিয় রায়চৌধুরীর মাতৃদেবী শ্রীমতি সরোজ রায়চৌধুরীর গত ১৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা, একপুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মঙ্গলনিধি

পূর্ব কলকাতা বিভাগের লোকনাথ নগরের প্রাক্তন সহ-নগর কার্যবাহ ও বর্তমানে প্রবাসী স্বয়ংসেবক বিক্রম ব্যানার্জী তাঁর কন্যার অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে কল্যাণ আশ্রমের ব্যানার্জী এবং শাশুড়ি ঝর্ণা মুখার্জী শ্রীদত্তের হাতে মঙ্গলনিধি তুলে দেন। পুরো ব্যাপারটাতে অভিভূত শ্রীদত্ত বলেন, "ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির মূক সবে। ম্লান মুখে লেখা শুধু শতশতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। সেই ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে ভারতের

মঙ্গলনিধি অনুষ্ঠানে বিক্রম ব্যানার্জীর পরিবারের সঙ্গে অদ্বৈতচরণ দত্ত, কেশব দীক্ষিত ও কালিদাস ভট্টাচার্য।

শিশুকল্যাণের জন্য ১৫ হাজার টাকা মঙ্গলনিধি হিসেবে প্রদান করেন। তবে এই মঙ্গলনিধি আর পাঁচটা মঙ্গলনিধির তুলনায় ছিল একেবারেই আলাদা। সেই অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে সকলকে আকর্ষিত করেছিল একটি ছোট্ট কাগজের বাক্স। তার ওপর লেখা ছিল 'শিশু কল্যাণে'-কল্যাণ আশ্রম। নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা ছিল 'ভালবাসা ও আশীর্বাদ-ই একমাত্র পাথেয়, উপহার সামগ্রী নহে। শিশু সাহায্যার্থে অনুদান গ্রহণযোগ্য।' নিমন্ত্রিতেরা বিষয়টি অনুধাবন করে খালি হাতেই এসেছিলেন, কিন্তু অকৃপণ দান করে যান শিশু কল্যাণের ওই তহবিলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত, বরিষ্ঠ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত প্রমুখ। বিক্রম ব্যানার্জীর পরিবারের তরফে তাঁর স্ত্রী মৌ, মা রেখা ৮ কোটি বনবাসী সমাজের দুর্দশা মোচনের জন্য বনবাসী কল্যাণ আশ্রম কাজ করছে। সমাজের কাজে আপনাদের সকলের সহযোগিতা কল্যাণ আশ্রম কামনা করে। আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের সকলের কাছে একটি উদাহরণ স্বরূপ।

* * *

গত ১০ ডিসেম্বর হাওড়ার শিবপুর-নিবাসী স্বপন কুমার নাগ তাঁর কন্যা অস্মিতার বিবাহ উপলক্ষে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের শিবপুর শাখার সভাপতি দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির তপন নাগ, কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভাপতি মিহির সেনগুপ্ত ও গন্ধবণিক দাতব্য শাখার জনৈক কার্যকর্তার হাতে ৫০০০ টাকা করে মঙ্গলনিধি তুলে দেন।

সূর্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ

ব্যক্তি বিকাশের সঙ্গে রাষ্ট্রের উন্নয়ন। সমন্বয়ের এক নবদিগন্ত হয়ে উঠেছে সূর্য ফাউন্ডেশনের ঝিঞ্ঝৌলি। দিল্লীর অদূরে এই স্থানটি দেশের আগামী দিনের এক সফল কর্মকাণ্ডের সাধনাস্থল হয়ে উঠছে। প্রতি বছর কম করে এক লক্ষ তরুণ-কিশোরের শারীরিক, মানসিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশের নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র। বিদ্যাভারতী এবং সংকল্প নামক সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আই এ এস, আই পি এস এবং আই টি ক্ষেত্রে সফল তথা দক্ষ ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সূর্য ফাউন্ডেশন।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার রাজ্যের টেবিল টেনিস

নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে ট্রফিজয়ী বাংলার ছেলেমেয়েরা।

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার টেবল টেনিসের স্বার্থে তিন বিবদমান সংস্থা কি মিলে যেতে পারে না? কিংবা পারস্পরিক মতানৈক্য ভুলে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে কি ইগোয় বাঁধে? সদ্য সমাপ্ত জাতীয় টেবল টেনিসের সময় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ঘুরে এই উপলব্ধিই হয়েছে প্রতিবেদকের। আর রাজ্যের সমস্ত প্রাক্তন খেলোয়াড় ও কোচ ঠিক এই জায়গাতেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তিন সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের বুঝিয়েছেন ভবিষ্যতে বাংলার টেবল টেনিসকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই সুসংহত ঐক্য ও সংহতিটাই আশু প্রয়োজন।

১৯৭৫-এ এই স্টেডিয়ামে বিশ্ব টেবল টেনিস অনুষ্ঠিত হবার পর থেকেই এই রাজ্যে খেলাটির প্রচার ও প্রসার লাভ হয়। শহর থেকে মফঃস্বল সর্বত্র ব্যাপক জোয়ার আসে। লাখো কচিকাঁচা বোর্ডের আশেপাশে জড়ো হয় চোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে। তাদের স্বপ্নের সওদাগর হয়ে দেখা দিলেন দুই সুসংগঠক গোপীনাথ ঘোষ ও প্রবীর মিত্র। মূলত তাঁদের উদ্যোগেই ১৯৭৫-এ বিশ্ব প্রতিযোগিতা সব দিক থেকে সফল হয়েছিল। নিজেরা আদ্যন্ত স্পোর্টসম্যান ছিলেন। টেবল টেনিসসহ সব খেলাই ভাল বোঝেন ও অন্তর থেকে ভালোবাসেন। তাঁদের সঙ্গে জুটে যায় আরও কয়েকজন কৃতি সংগঠক। উঠে আসে জয়ন্ত পুশিলাল, তপন চন্দ, দিলীপ ও দীপ্তিময় মুখার্জি ভ্রাতৃদ্বয় সহ বেশ কয়েকজন সুদক্ষ কোচ।

কলকাতার পাশাপাশি চন্দননগর, উত্তরপাড়া, হুগলি, ব্যারাকপুর, কল্যাণী, নৈহাটি— গঙ্গার দু’পাড় জুড়ে প্রায় সবকটি মফঃস্বল শহরে খেলাটি ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলস্তর থেকে ক্লাবস্তর অসংখ্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের শহর শিলিগুড়ি ও বর্ধমানের দুর্গাপুরে অন্যসব খেলাকে হটিয়ে দিয়ে টেবল টেনিস এক নম্বর জনপ্রিয় খেলা হয়ে দাঁড়ায়। এসবই বাংলার টেবল টেনিসের একমাত্র নিয়ামক সংস্থা বি টি টি এ-র ফলশ্রুতি। আটের দশকের সময় থেকে বাংলা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে একের পর এক কুশলী খেলোয়াড়। ইনট্যাব থেকে সিনিয়র সর্বস্তরে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন তৈরির আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে নারকেলডাঙা, চন্দননগর, শিলিগুড়ি।

১৯৯৪ সালটি বাংলার টেবল টেনিসের ইতিহাসে সোনার কালিতে লেখা অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। সে বছরটি ছিল বি টি টি এ-র হীরক জয়ন্তী বর্ষ। হীরক জয়ন্তী বর্ষে জাতীয় আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়। আর নেতাজি ইন্ডোর জুড়ে টানা সাতদিন বর্ণময় উদ্ভাস মেলে ধরেছিল বাংলার ছেলেমেয়েরা। সেবারেও প্রধান কোচ ছিলেন জয়ন্ত পুশিলাল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দীপ্তিময় মুখার্জিও। দলগত দু’বিভাগ থেকে ব্যক্তিগত পুরুষ ও মহিলা সব ক্ষেত্রেই চাম্পিয়ন হয়ে ভারতীয় টেবল টেনিসে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল বি টি টি এ। তার পরের কয়েক বছরও বি টি টি এ বাংলার টেবল টেনিসের পেরেন্ট বডি হিসেবে কাজ চালিয়ে গেছে। এরপরই শুরু হলো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও পশ্চাৎ অপসারণের পালা।

নতুন শতকের গোড়া থেকেই কালো মেঘ ঘনীভূত হতে থাকে বাংলার টেবল টেনিসের দিকচক্রবালে। বি টি টি এ থেকে বেরিয়ে এসে প্রবীর মিত্র গঠন করলেন পৃথক রাজ্য সংস্থা ডব্লু বি টি টি এ। জাতীয় সংস্থা বা টি টি এফ আই এই সংস্থার পাশে এসে দাঁড়িয়ে অবৈধ ঘোষণা করে দিল বি টি টি এ-কে। শুরু হলো চাপান উতোর, দিশেহারা খেলোয়াড়রা। সব মিলিয়ে চরম অব্যবস্থার শিকার হতে হলো খেলোয়াড়দের। যেসব খেলোয়াড় গোপীনাথ ঘোষের স্নেহধন্য ও বি টি টি এ-র পরিকাঠামোয় বেড়ে উঠেছে তাদের জন্য জাতীয় দলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। উঠতি, প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়রা কোনও শিবিরে থাকবে, তা নিয়েও চরম বিভ্রান্তি। গোপীনাথ ঘোষ ও বি টি টি এ-র উন্নত পরিকাঠামো ও কোচিংয়ে থাকলে খেলার গুণগত মান বেড়ে যাবে। অন্যদিকে প্রবীর মিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে জাতীয় দলের খেলা হবে না।

খেলার জগৎ

গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো এরপর আত্মপ্রকাশ করল উত্তরবঙ্গ টেবল টেনিস সংস্থা। প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মান্তু ঘোষ মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের সহায়তায় পৃথক সংগঠন খাড়া করে উত্তরবঙ্গকে বের করে নিলেন ডব্লু বি টি টি এ এবং বি টি টি এ থেকে। তবে মান্তু বুদ্ধি মান, প্রতিবেশী মন্ত্রী অশোকবাবু, রাজ্য মন্ত্রিসভা এবং টি টি এফ আইয়ের সর্বময় কর্তা মূলচাঁদ চৌহানের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার পাশাপাশি শিলিগুড়ির ছেলেমেয়েদের উঠে আসার পথ সুগম করেছেন। এজন্য অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য মান্তুর। আজও তাই শিলিগুড়ির ছেলে-মেয়েদের দাপট অব্যাহত। আর এই তিনটি সংস্থাই রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। অশোক ভট্টাচার্য, রবীন দেব (বি টি টি এ), সোমনাথ চ্যাটার্জি (ডব্লু বি টি টি এ) তিন সংস্থার মাথায় বসে পারস্পরিক কোন্দল না মিটিয়ে কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন। তবে যেহেতু শহর থেকে মফঃস্বল হয়ে গ্রাম প্রত্যন্তের সর্বত্র খেলাটি জীবনের মূলস্রোতে জড়িয়ে গেছে। তাই দ্বন্দ্ব, রাজনীতি সত্ত্বেও বাংলার ছেলেমেয়েরা সর্বভারতীয় মঞ্চে এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এদের ও ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে কি তিনটি সংস্থা মিলে যেতে পারে না বৃহত্তর লক্ষ্যে?

শব্দরূপ - ৫৬৯

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	■	১	২			৩	■
■	■	■		■	■		■
৪	৫	■	৬		৭		■
■	৮	৯		■		■	■
■	■		■	১০		১১	■
■	১২				■	১৩	
■		■	■		■	■	■
■	১৪					■	■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. সুকুমার রায়-সৃষ্ট খ্যাপাটে চরিত্র, ৪. ত্যাগধর্মের আদর্শ প্রাচীন ভারতীয় নৃপতি, ৬. ভেড়ার পাল, ৮. অনবধানতা, ভ্রান্তি, ১০. কোমরের সুতা, কটিসূত্র, ১২. বিদায় করা, দূর করা, ১৩. মহাকায় সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জন্তু, ১৪. মুনিবিশেষ; নাগমাতা দেবী মনসার স্বামী।

উপর-নীচ ঃ ২. ভাবের আতিশয্যে জড়িত, ৩. আলজিভ, ৫. ব্রাহ্মণ, ৭. লিপি, লিখিত বিষয় (‘ললাটের—’), ৯. সূর্যবংশীয় রাজাবিশেষ; আগাগোড়া জননী, ১০. কাঠের পোকা বিশেষ;অভিজ্ঞ, পরিপক্ক, ১১. শুক্ল, কৃষ্ণ বা নীল, ১২. শোভামান হইয়া অবস্থান।

সমাধান শব্দরূপ ৫৬৭

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।
আশীষ বড়াল
শিবপুর, হাওড়া-৩

■	ক	■	সা	■	বা	তা	বি
■	চ	কো	র	■	টি	■	শ
ব	■	■	মে	ন	কা	■	ল্য
রা	জ	সূ	য়	■	■	■	ক
হ	■	■	■	জা	তি	স্ম	র
মি	■	অ	চ্যু	ত	■	■	ণী
হি	■	ন	■	প	য়া	র	■
র	ক্তা	ঙ্গ	■	ত্র	■	ম্ভা	■

সমাধান শব্দরূপ - ৫৬৮

সঠিক উত্তরদাতা

সৌম্য দাস
কলকাতা-৫৩

■	■	য	ম	দূ	তি	কা	■
■	■	■	ল	■	■	ম	■
বী	রা	■	মা	য়া	বা	দ	■
■	কা	পা	স	■	হ	■	■
■	■	কু	■	গ	বা	ক্ষ	■
■	স	ড়	গ	ড়	■	পা	ট্টা
■	রা	■	■	গ	■	■	■
■	ব	ন	চাঁ	ড়া	ল	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

● ৫৬৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ সংখ্যায়

হুঁশিয়ার মমতা ব্যানার্জী

বিশাখা বিশ্বাস

বুদ্ধের হার্মাদবাহিনী লালগড়ে যে বর্বরতার বীভৎস হত্যা-উল্লাসে মেতেছে তা কেবল ডালকুত্তাদেরই মানায়— যদিও ডালকুত্তারা শিকারকে দাঁতে-নখরে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেও মার্ক্সবাদী হার্মাদদের মতো গণ বলাৎকার করে না। এই প্রেক্ষাপটেই পরিস্থিতি মমতা ব্যানার্জীকে হুঁশিয়ারী দিয়ে বলছে, মমতা ব্যানার্জী সতর্ক হোন, তার অনুগামীদের শান্ত রাখুন, সংযত রাখুন, শক্তিশালী নেত্রী হিসেবে এই সামান্য দায়িত্বটুকুই সর্বাগ্রে পালন করুন।

ঝড়ের পাখীরা আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাসে দিক বদল করে যারা সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে আশ্রয় নিয়েছিল, নবোদিত পার্টির নাম ভাঙিয়ে তারা করেকম্মে খাচ্ছে। সিপিএমের পরিকল্পনা মতো তার ক্যাডারেরা সিপিএম ছেড়ে সিপিএম-এর কপট বিরোধিতায় নেমেছে তৃণমূলের ইমেজ-নাশকতায়। সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে সিপিএম-এর অত্যাচারে যাদের ধোপা-নাপিত ঝি-বাগাল বন্ধ হয়েছিল, মিথ্যা মামলায় এবং নীরব হামলায় গ্রামে-গঞ্জে যাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ফসল, উঠোনের ধান সিপিএম-এর হার্মাদেরা কেড়ে নেবার পরও যারা সিপিএম-এর ধার্য করা পাত্রে ঘরের মেয়েকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল, যারা পুলিশে-প্রশাসনে-বিরোধী দলে সব জানিয়েও কোনও প্রতিকার পায়নি, শহরের-কলকাতার সো-ঔশলা বুদ্ধিজীবী থেকে ফীচার-লিখিয়েদের লেখাতেও যাদের বেদনা-বিড়ম্বনার কোনও কাহিনীকে কোনদিন বিশ্বাস করাতে পারেনি— বিগত নির্বাচনগুলিতে সাফল্য পাবার পরে তৃণমূলকে ঘিরে সেইসব হতদরিদ্র উৎপীড়িত মানুষেরাই সদ্য ভূমিষ্ঠ গো-বৎসের মতো আজ স্বাভাবিক জীবনে ফেরার আনন্দে উচ্ছৃঙ্খলতায় এদিক-ওদিক লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। ফলতঃ, শিক্ষিত বাগী ও বচনভঙ্গীর দ্বারা সিপিএম হুইসপারিং ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে জনগণের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে সেই তত্ত্ব যে, ক্ষমতায় আসার আগেই যদি এই রকম অবস্থা হয় তাহলে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে এরা রাজ্যকে উপহার দেবে কোন্ আরণ্যক নৈরাজ্য! বলা বাহুল্য, সিপিএম সাফল্য পাচ্ছে এবং তত্ত্বটিকে তারা কিছু কলকাতাই বাবু-বিবি সহ কিছু লিখিয়ে, কিছু মিডিয়ার ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী এবং এমনকী কিছু পরাশ্রয়জীবী কংগ্রেস-নেতা-নেত্রীদেরও গেলাতে সমর্থ হয়েছে। সেইসাথে এরা যারা আগে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ নিয়ে চেঁচাতেন এবং এখন যারা সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের ভয়ঙ্কর ক্যাশিনো-ক্যাপিটালিজিম (জুয়ারীর ধনতন্ত্র) এবং তারই পদচিহ্নপূজক শিল্পপতিদের লগ্নিপুঁজি ছাড়া এগোনোই যাবে না বলে রাতদিন বাক্‌বিপ্লবের সাথে শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন করে চলেছেন। তারা আরেকটি অর্বাচীনতাকে বাজারে ছাড়ছেন যে, জ্ঞানেশ্বরী-হত্যাকাণ্ডে মমতার প্রচার কত মিথ্যা এবং ঘটনাটি আসলে মাও-পন্থীদের কার্য বলে তাদের অভিমতটি কতখানি নির্ভেজাল ছিল। বস্তুত, ধৃত ব্যক্তিগণ যারা জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডে সিবিআই কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়েছে তারা সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি ঘটাবার কত ঘণ্টা অথবা কতদিন আগে সিপিএম থেকে দলত্যাগ করে কোন্ লক্ষ্যে মাওবাদীদলে অনুপ্রবেশ করেছিল, সিবিআই নয়, কেবল মাত্র আদালতই সেই রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচনের অধিকার প্রাপ্ত রয়েছে। কিন্তু কৌশলপার্টির একচেটিয়া কুশলতায় এবং লাগাতার প্রচারে জনসংখ্যার একটা ভালো অংশ এমনকী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, জ্ঞানেশ্বরীর অপঘাত কাণ্ডে মাওবাদীরাই মূলতঃ দায়ী।

চৌত্রিশ বছরের ঐতিহাসিক কীর্তিকে অমর করার মরীয়া উৎসাহে যারা বেছে নিয়েছিল নির্বাচনের খোলা জালিয়াতির রাস্তা, যারা সেজন্যে কেড়ে নিয়েছিল গৃহবধূর সীমন্ত-সিঁদুর, ধর্ষিতা কুমারীর জীবন, সু-স্নিগ্ধ গ্রামাঞ্চলের শান্তি সুখের জীবন— আত্মসমালোচনা এবং ভুল স্বীকার করতে করতে ইতিহাসে স্থাপত্য হয়ে যাবার পর তাদেরই নেতা ঐতিহাসিক 'তথাগতজী' শ্বেতবস্ত্রে বরসজ্জ আচ্ছাদন করে সম্প্রতি বলেছেন, 'তৃণমূল পরিচালিত জেলাপরিষদ -গুলিতে কোনও উন্নয়নই হয়নি।'

ধরে নেওয়া যায়, তৃণমূল পরিচালিত দু-বছরের পরিষদগুলিতে 'কোনও কাজই হয়নি'। কিন্তু চৌত্রিশ বছর ধরে যাদের শাসনে ২৪ পরগণাগুলির প্রতি ৭৪৮৮ জন রোগীর জন্যে মাত্র একটি হাসপাতালের বেড, পুরুলিয়ায় লোকবসতি কম হলেও বেড প্রতি ২৫৮৬ জন রোগী এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে ৩৯৯৯ জনের জন্যে একটি মাত্র বেড কেন সেই প্রশ্নের জবাব যারা দেয় না তাদের খলতা অনুমানসাপেক্ষ। পানীয় জলের ক্ষেত্রে তৃণমূল তার নির্বাচনী ঘোষণামাফিক জলকর রোহিত করেছে, কিন্তু সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের 'সুশাসনপর্বে'ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রায় ৪ শতাংশ মানুষ এখনো খাল-বিলের জল এনে খায় কেন, কেন পুরুলিয়ার ৫২.১০ শতাংশ মানুষ বালি খুঁড়ে খালের জল পান করতে বাধ্য হয়, কেন রাজ্যের মোট অধিবাসীর প্রায় ১৮ শতাংশ মানুষ কাঁদর-বাঁওরের জল খেয়ে থাকে— তার কোনও ব্যাখ্যা পুঁজিপতিদের হাউইহাই বেলুনে উন্নয়নের আকাশে পাড়ি দিতে দিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভুলে যায় (জলকর নিতে আমরা বিদেশী কোম্পানীর কাছে চুক্তিবদ্ধ বলার ঘণ্টাচারেক পরেই মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য ডিগবাজী দিয়ে বলেন 'জলকর না নেওয়াই ভালো')। কেন চৌত্রিশ বছরের একচ্ছত্র 'কাজের ভিত্তিতে' জেতা সরকারের শাসনের পরেও এরাজ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ৪০.৮৯ শতাংশ মানুষ, পুরুলিয়ার ৩০ শতাংশ মানুষ এবং রাজ্যের প্রায় ৩৫ শতাংশ মানুষ আজ একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও রেডিও/টিভি/ কোনও কাগজের নাম জানে না? বামবাদিদের মহিলাসমিতির নায়িকা শ্যামলী গুপ্তের কাছে জিজ্ঞাসা, কেন আজও নিরক্ষরতা দূরীকরণে কোটি কোটি টাকা খরচের পরেও ২৪ পরগণায় (দঃ) প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ, পুরুলিয়ায় প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রায় ৩৪ শতাংশ মানুষ আজও টিপসই দায়? কেন চৌত্রিশ বছরের সৎ-প্রশাসনের তত্ত্বের পরেও কেবলমাত্র গত ডিসেম্বর মাসেই এরাজ্যে প্রভিডেন্ড ফান্ড ফাঁকির সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি? কেন চৌত্রিশ বছরের বামবাদী শাসনের শেষেও এরাজ্য থেকে নারী পাচারের ক্ষেত্রে রাজ্য প্রথমার গৌরব প্রাপ্ত হয়? কেন দাগী আসামীরাও দলের 'সম্পদ' বলে সম্মানীত হয়? কেন শিক্ষক হত্যারক পুলিশ-অফিসারও সসম্মানে স্বপদে বহাল হয়? বাংলার দুর্বুদ্ধিজাত স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবীর দল যারা বত্রিশটি বছর ধরে বামবাদের সাথে স্থিতি জাড্যে আটকে ছিল— তারাও এর কী দেবেন জবাব?

চৌত্রিশ বছরের নির্মম নৃশংস অত্যাচারে, নিষ্ঠুর পৈশাচিক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে, পাশবিক গণবলাৎকারে, জমির ডাকাতিতে, পরিকল্পিত উৎখাত ও উচ্ছেদে, মিথ্যা কথার ভণ্ডামীতে, পার্টি-পুলিশ-প্রশাসনের ওপর বিরক্ত মরীয়া সাধারণ মানুষ আজ যখন নিজেরাই একটি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছেন এবং আন্দোলনের রাশটি মমতা ব্যানার্জির কাছে অস্থায়ী ভাবে আপাততঃ চলে গেছে— তখন মমতা ব্যানার্জীকেই সেইসব স্বার্থান্বেষী ঝড়ের পাখী, অনুপ্রবিষ্ট ছদ্মবেশী সিপিএম হার্মাদ এবং এমনকী সেইসব অগণিত নির্যাতীত মানুষকে শান্ত এবং সংযত আচরণের রজ্জুতে বেঁধে সুশৃঙ্খলাপরায়ণ করার দায়িত্ব নিতে হবে। অত্যাচার-অবিচারের মধ্যে জাত সমাজের প্রতি দয়হীন মানবিক বুদ্ধিহীন মানুষ নিয়ে হিটলারের গড়া সেই ব্লাক রেজিমেন্টের মতো বুদ্ধের হার্মাদবাহিনী, নানা বীভৎসার মধ্যে লালিত স্ট্যালিনের হাতে গড়া সেই 'চেকা'-র মতো বুদ্ধের হার্মাদ বাহিনী, ইটালীর সেই ফ্যাসীবাদী বাহিনীর মতো বুদ্ধের হার্মাদবাহিনী লালগড়ে যে বর্বরতার বীভৎস হত্যা-উল্লাসে মেতেছে তা কেবল ডালকুত্তাদেরই মানায়— যদিও ডালকুত্তারা শিকারকে দাঁতে-নখরে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেও মার্ক্সবাদী হার্মাদদের মতো গণ বলাৎকার করে না। এই প্রেক্ষাপটেই পরিস্থিতি মমতা ব্যানার্জীকে হুঁশিয়ারী দিয়ে বলছে, মমতা ব্যানার্জী সতর্ক হোন, তার অনুগামীদের শান্ত রাখুন, সংযত রাখুন, শক্তিশালী নেত্রী হিসেবে এই সামান্য দায়িত্বটুকুই সর্বাগ্রে পালন করুন।

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৯তম জন্মদিবস উপলক্ষে বিজ্ঞান ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ শাখা বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন পূর্বী শক্তি (উর্জা) যাত্রার (কলকাতা থেকে নাগপুর) আয়োজন করে। ওইদিন স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর কলকাতাস্থ জন্মভিটেয় স্থিত মূর্তিকে প্রণাম জানিয়ে শ-পাঁচেক ছাত্রছাত্রীর একটি মিছিল রবীন্দ্র-সদনে পৌঁছোয়। সেখানে পতাকা নাড়িয়ে নাগপুরের উদ্দেশ্যে মূল যাত্রার শুভ সূচনা করেন কলকাতার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। – ছবি : শিবু ঘোষ

কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক এবং ভারতের ইলেকশান কমিশনের যৌথ উদ্যোগে কলকাতার সল্টলেকে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস (এন ইউ জে এস)-এ দ্বিতীয় রিজিওনাল ইলেকশান রিফর্মস কনসালটেশন ওয়ার্কশপ আয়োজিত হলো গত ৯ জানুয়ারি। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বীরাপ্পা মইলি, মুখ্য নির্বাচক আধিকারিক এস ওয়াই কুরেশী ও বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের আইনমন্ত্রী ছাড়াও মুম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, ত্রিলোচন শাস্ত্রী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যেই ভূপালে এই ধরনের কর্মশালা হয়েছে। এরপর আরও কয়েকটি হবার পর চূড়ান্ত কর্মশালাটি আগামী ২ ও ৩ এপ্রিল নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে। – ছবি : কৃশানু মিত্র

RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

আন্দামানে হিন্দু সম্মেলনে বনবাসীরা নৃত্যের মাধ্যমে সুদর্শনজীকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

আন্দামান সফরে নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন

সংবাদদাতা।। গত ১১ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আন্দামান সফর করলেন সঙ্ঘের প্রাক্তন সরসঙ্ঘচালক শ্রী কে এস সুদর্শন। আন্দামানের সঙ্ঘ তথা বিবিধ ক্ষেত্রের একাধিক কার্যক্রমেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

১১ তারিখ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করেন। ১২ জানুয়ারি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ছাত্র-যুব সম্মেলনে তিনি বক্তব্য রাখেন। ১৩ জানুয়ারি বকুলতলা বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ডাকে এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১ হাজারের বেশি মায়েরা ও প্রায় আড়াই হাজার সাধারণ মানুষ এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে সুদর্শনজীর বক্তব্য শোনেন।

১৪ জানুয়ারি আম্রকুঞ্জ গঙ্গামন্দিরে যজ্ঞানুষ্ঠানসহ গঙ্গামাতার পূজাতে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

১৫ তারিখ মকর সংক্রান্তি উৎসব এবং ওই দিনই তিরঙ্গাপার্কের বিরাট হিন্দু সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী হরিপদানন্দজী, হরিনারায়ণ অরোরা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সহ সঙ্ঘের সর্বভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল প্রমুখ।

শিশুমন্দিরের রজত জয়ন্তী উৎসবে স্মারকগ্রন্থ উন্মোচন করছেন সুদর্শনজী।

পোর্টব্লেয়ার সরস্বতী শিশুমন্দিরের রজত জয়ন্তী

সংবাদদাতা।। পোর্টব্লেয়ার সরস্বতী শিশুমন্দিরে রজত জয়ন্তী সমারোহ অনুষ্ঠান গত ১৬ জানুয়ারি সম্পন্ন হলো। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ আন্দামান জেলাপরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি তামিলাশ্রী, বিদ্যাভারতীর পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র মাহাতো, সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের প্রাক্তন ক্ষেত্র প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী, দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল প্রমুখ।

এদিন সকাল ৯টায় সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিকাল দুটো থেকে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন ভাষায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান 'গীত সুধা'। শিশু ভাইবোনেদের অভিভাবক- অভিভাবিকা ছাড়াও আন্দামানের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রমুখ ব্যক্তিসহ প্রায় সহস্র মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মালদায় লোকমাতা নিবেদিতার মহাপ্রয়াণ-শতবর্ষ স্মরণে শোভাযাত্রা

মালদায় ভগ্নী নিবেদিতার প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করছেন প্রমীলা তাই মেঢ়ে।

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। ভগিনী নিবেদিতার মহাপ্রয়াণ শতবর্ষ উপলক্ষে গত ৮ জানুয়ারি মালদা শহরে নিবেদিতা স্মারক সমিতি, উত্তরবঙ্গ শাখা এক শোভাযাত্রা ও জনসভার আয়োজন করেছিল। পরিচালনার দায়িত্বে ছিল রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মালদা শাখার ওপর। মালদা হিন্দি হাইস্কুলের সামনের ময়দান থেকে দুপুর ১.৩০ মিনিটে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্ল্যাকার্ড, গেরুয়া পতাকা ও ট্যাবলো নিয়ে শহরের নেতাজী মোড় হয়ে নেতাজী সুভাষ রোড ধরে দুর্গাবাড়ি, বি এস রোড, প্রধান ডাকঘর হয়ে আবার উক্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয়। মালদা শহরের বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এবং মালদা ও গাজোলের শিশু মন্দিরের ছাত্র-ছাত্রী ও আচার্য-আচার্যা সহ ৮০০-এর বেশি মানুষ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর জনসভার মঞ্চে রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী পরাশরানন্দজী মহারাজ প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা বাণী মিশ্র, প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ পল্লব দাশগুপ্ত প্রমুখ। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন অখিল ভারতীয় প্রমুখ সঞ্চালিকা (রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি) প্রমীলা তাই মেঢ়ে। সন্ন্যাসিনী কেতকীপুরী (মাধব নগর), সমিতির অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হলদেওকর, প্রান্ত সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রভা সরকার, প্রান্ত কার্যবাহিকা স্বপ্না চক্রবর্তী ও সম্পাদক বন্দনা রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুনীতা হলদেওকর, ডঃ পল্লব দাশগুপ্ত প্রমুখ।

শ্রীমতি প্রমীলা তাই মেঢ়ে বলেন, নিবেদিতা হিন্দুত্বকে নিজের জীবনে আচরণের মাধ্যমে দেখিয়ে গেছেন। স্বদেশীবস্ত্র, স্বদেশী খেলা এবং ভারতের সেবসেবীকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। তাই দেখতে পাই তাঁর লেখা 'অলী দি মাস্টার', দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম, 'শিব অ্যান্ড বুদ্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি এদেশের মহাপুরুষদের কথা উল্লেখ করেছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী পরাশরানন্দজী মহারাজ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমতী নীতা সাহা। উল্লেখ্য, মঞ্চের পাশে ঠাকুর রামকৃষ্ণ, ভগ্নী নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দ ও মা সারদার বেশে মাধব নগর বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের সুন্দর ভাবে সেজে অংশ গ্রহণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

শিল্পসুষমায় অনবদ্য। বারাণসীতে গত ১৯ জানুয়ারি জনৈক দেশপ্রেমিক শিল্পী বালুচরেই গড়ে তুলেছেন দেশমাতৃকার অবয়ব। স্বপ্নের ভারতবর্ষকে।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ : সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com